Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুজানা আখতার

রোলঃ 228022024

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুজানা আখতার

রোলঃ 228022024

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুজানা আখতার, আইডিঃ 228022024 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sujana Akhter

(স্বাক্ষর)

সুজানা আখতার

আইডিঃ 228022024

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা..5
অর্থনীতি 6
বিভিন্ন প্রকার টাকা..7
মুদ্রাস্ফীতির কারণ..11
মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতি 12
ব্যাংকব্যবস্থা 14
প্রচলিত অর্থব্যবস্থা..21
পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা 21
সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা 23
ইসলামী অর্থব্যবস্থা :..25
অর্থনৈতিক সমস্যা আসলে কি?..28
অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আসল কারণ 31
সমাজতন্ত্রের প্রস্তাবিত সমাধান 38
নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা..39
ফ্যাসিবাদের সমাধান..41
ইসলামী অর্থব্যবস্থা মূলনীতি..41
উপার্জনের বাধা-নিষেধ বা হারাম পন্থা 43
গণিমত বা বিজিত সম্পদ বন্টন 51
অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের ইসলামী সমাধান 55
রোগ নিরূপণ 58
ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান 63

যাকাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি.....64
ইসলামে ‘করজে হাসানাহ’র নির্দেশ ও উপকারিতা.....67
শিরকাত ও মুদারাবা.....70
মুরাবাহা.....71
মুসলমানের করণীয়.....72

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের জীবন, জীবন ঘনিষ্ঠ প্রতিটি ছোট বড় বিষয়ই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য ইসলামকে দিন হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছেন। যেমনটি কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

اَ لْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَ تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম।"

(আল মায়েদা: ৩)

এই কথাটি মুসলমান হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি এবং মুখে বলেও থাকি।তবে প্রায়োগিক দিক থেকে জীবনের কিছু বিষয়কে ইসলাম বহির্ভূত বলে মনে করি। আমরা মনে করি এগুলো নিতান্তই দুনিয়াবি বিষয় এগুলোর সাথে ইসলাম কিংবা আখিরাতের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন সাধারণ লেখাপড়া, চাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি। এদের মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে অর্থনীতি। সাধারণ মুসলমান এমনকি সচেতন মুসলমানের মধ্যেও অর্থনীতি বিষয়ে কিছুটা উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থনীতির অগ্রগতি বা অবনতি অর্থাৎ অর্থ সম্পদ, টাকা করি সম্পর্কে চিন্তা করা যেন মুসলমানের নেতিবাচক আচরণ হিসেবে ধরা হয়।

অর্থনীতি বিষয়ে এই উদাসীনতার কারনে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন বিশেষ কিছু পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ। যা আমাদেরকে দিন দিন অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। একদিকে সমাজে ধনী গরিবের বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এই বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা আমাদের নীতি নৈতিকতার ওপর ব্যাপক ফেলছে। যা সমাজকে দীর্ঘমেয়াদি অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করছে।

তাই সামাজিক এই অস্থিরতা ও অবক্ষয় হ্রাস করার জন্য আমাদেরকে অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। ইসলাম অর্থনীতির ব্যাপারে যে সকল দিক নির্দেশনা দেয় তা অনুসরণ করে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সচেতন হতে হবে। যা একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুক।

'অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা' নামক এই থিসিস পেপারে অর্থনীতি, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা ও আমাদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার এই কাজকে আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুক এবং এই কাজকে উম্মতের কল্যাণে কবুল করুন।

অর্থনীতি

সংজ্ঞা

অর্থনীতি হলো সীমাবদ্ধ সম্পদের এবং আয় ও নিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহের প্রশাসনিক পর্যালোচনা। অর্থনীতি বা Economics শব্দটি গ্রিক শব্দ Oikonomia শব্দ থেকে এসেছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগন অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন:- "অ্যাডাম স্মিথের মতে, অর্থনীতি হচ্ছে সম্পদের বিজ্ঞান অর্থাৎ অর্থনীতি সম্পদ সংগ্রহ এবং বন্টন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করে।" "অধ্যাপক মার্শালের মতে, অর্থনীতি মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে পর্যালোচনা করে, এটি বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি ও সমাজের কার্যাবলির সেই অংশ, যা কল্যাণের বস্তুগত প্রয়োজনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বিষয়ের ব্যবহার ও অর্জন প্রক্রিয়া।”

অর্থনীতির সৃষ্টি হয় বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের হাত ধরে, তাই অ্যাডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলা হয়ে থাকে।

সবকিছুই কি অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত? না। অর্থের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাকেই অর্থনীতি বলা হয়ে থাকে।

যেমন:-একজন পেশাদার খেলোয়াড় দেশের জন্য ক্রিকেট খেলেন এবং তার বিনিময়ে তিনি টাকা পায়। যা একটি অর্থনৈতিক ঘটনা এবং অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু অন্যদিকে একজন সাধারণ মানুষ যদি বন্ধুদের সাথে বিকেলে মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলেন, এর সাথে অর্থের কোন সম্পর্ক নেই তাই এটা অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়।

অর্থনীতির প্রকারভেদ।

অর্থনীতিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন:-

১. ব্যষ্টিক অর্থনীতি বা Micro Economics.

২. সামষ্টিক অর্থনীতি বা Macro Economics.

১. ব্যষ্টিক অর্থনীতি:

ব্যষ্টিক শব্দটি ইংরেজি শব্দ Micro যা গ্রিক শব্দ Mikros থেকে উৎপত্তি হয়েছে। Mikros এর বাংলা অর্থ অতি ক্ষুদ্র। অর্থনীতির প্রতিটি এককের আচরণ ও কার্যকলাপ যখন পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে। ব্যষ্টিক অর্থনীতি ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিক বিষয় নিয়ে কাজ করে। যেমন:- ব্যক্তিগত চাহিদা, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং কোন একটি প্রতিষ্ঠানের আয়, ব্যয়, মুনাফা প্রভৃতি ব্যষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে বিবেচ্য। মূলত ব্যষ্টিক অর্থনীতি এক একটি ফার্ম, প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেকটি দ্রব্যের দাম, মজুরি, প্রত্যেকটি শিল্প এবং প্রত্যেকটি দ্রব্য সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করে। ব্যষ্টিক অর্থনীতির পরিধি সংকীর্ণ এবং এর মাধ্যমে দেশের খণ্ড বা আংশিক চিত্র পাওয়া যায়।

২. সামষ্টিক অর্থনীতি:

সামষ্টিক শব্দটি ইংরেজি Macro যা গ্রিক শব্দ Macros থেকে এসেছে। Macros এর বাংলা অর্থ বড় বা সামগ্রিক। অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যাকে একক বা খণ্ড খণ্ডভাবে ব্যাখ্যা না করে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করলে তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে। যেমন:- জাতীয় উৎপাদন, মোট জাতীয় আয়, মোট সঞ্চয়, মোট বিনিয়োগ, মোট ভোগ ব্যয় ইত্যাদি সামষ্টিক অর্থনীতির উপাদান। সামষ্টিক অর্থনীতির পরিধি বিস্তৃত, এর মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ অর্থব্যবস্থার সম্পর্কে জানা যায়। পরিশেষে বলা যায়, সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে, জাতীয় আয়, কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তে দামস্তর, গড়, সুদ, ও মজুরি এবং ব্যক্তিগত উৎপাদনের পরিবর্তে জাতীয় উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করে।

অর্থনীতির কিছু পরিভাষা

অর্থনীতি বিষয়ে ধারণা লাভ করতে হলে আমাদের অর্থনীতির পরিভাষাগুলো জানতে হবে।এখানে কিছু পরিভাষা আলোচনা করা হলো।

বিভিন্ন প্রকার টাকা

কাগজের টাকা

পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানুষ নতুন নতুন বস্তু উদ্ভাবন করে আসছে। এমনই একটি চমকপ্রদ উদ্ভাবন হচ্ছে কাগুজে মুদ্রা। একসময় টাকা বলতে মানুষ বুঝত সোনা, রুপা, তামা ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও কড়ি, ট্যালি স্টিক (কাঠের মুদ্রা), লবণ ইত্যাদিকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে মধ্যযুগের পরবর্তীতে ইয়োরোপে বহুল ব্যবহৃত একটি মুদ্রা হয়ে যায় সোনা।

তবে সোনা ব্যবহারের সমস্যা হচ্ছে এটি ওজনে ভারী এবং ঘরে সংগ্রহ করে রাখা অনিরাপদ। এই সমস্যা এড়াতে আগের যুগের মানুষ স্বর্ণকারের সিন্দুকে সোনা জমা দিয়ে আসত। বর্তমানে আমরা যেমন ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে রিসিট নিয়ে বাড়ি ফিরি, ঠিক তেমনি সেই যুগের মানুষ সিন্দুকে স্বর্ণ জমা দিয়ে তার বিপরীতে একটি কাগজ নিয়ে বাড়ি ফিরত। কাগজে লেখা থাকত এই ব্যক্তি সিন্দুকের এতটি স্বর্ণমুদ্রার মালিক।

এভাবে কিছুদিন যাবার পর মানুষ ভাবতে শুরু করল সিন্দুক থেকে সোনা না তুলে বিক্রেতার হাতে কাগজ তুলে দিলেই তো হয়। কেউ চাইলে স্বর্ণকারের থেকে সোনা তুলে আনতে পারবে অথবা নিজেও রিসিটের বিনিময়ে অন্য কিছু কিনবে। এই চিন্তা থেকেই নামবিহীন রিসিট আসা শুরু হয় (অর্থাৎ, রিসিট যার হাতে থাকবে সেই হবে সোনার মালিক)। এভাবে বড় কেনাকাটায় রিসিট ব্যবহার চলতে থাকল এবং মানুষজন কাগজ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। ধীরে

ধীরে স্বর্ণ না তুলে সবাই কাগজ হাত বদল করেই অন্যান্য কেনাকাটা শুরু করল এবং ছোট বড় বিভিন্ন রকম নোট বের করতে থাকলযার নাম দেওয়া হলো ব্যাংক নোট বা টাকা। এভাবেই প্রবর্তন হয় কাগুজে মুদ্রার। সর্বপ্রথম চীনে ৭ম শতাব্দীতে তামার মুদ্রার বিপরীতে কাগুজে মুদ্রা উদ্ভাবিত হয় এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ১৭ শতাব্দীতে স্থায়ী ব্যাংক নোট চালু করে।

ফিয়াট কারেন্সি

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। প্রলয়ঙ্করী সেই যুদ্ধের আর্থিক ক্ষতি সবাইকেই স্পর্শ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং অন্য ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিতে হয়। যুদ্ধ পরবর্তীতে সেই ঋণ পরিশোধ করার হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেল ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর স্বর্ণের মজুদ অনেক কমে গিয়েছে এবং এই অবস্থায় তাদের মুদ্রার বিপরীতে পর্যাপ্ত স্বর্ণ মজুদ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

বিশ্বযুদ্ধের সেই সংকটের মধ্যেই স্বর্ণ-ভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা ধরে রাখার জন্য ১৯৪৪ সালে আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসে ৪৪টা মিত্র দেশের মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, একমাত্র মার্কিন ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ মজুদ থাকবে। বাদ বাকি সকল মুদ্রার বিপরীতে মার্কিন ডলার মজুদ থাকবে। প্রতি ৩৫ ডলারের বিপরীতে ১ আউন্স স্বর্ণ মজুদ থাকবে এবং অন্য সকল দেশের মুদ্রার মান মার্কিন ডলারের বিপরীতে নির্ধারিত হবে। এই চুক্তির কারণে সব রাষ্ট্র তাদের মুদ্রার বিপরীতে স্বর্ণ মজুদ রাখার দায় থেকে মুক্তি পায় (আমেরিকা ব্যতীত) এবং তাদের স্বর্ণের মজুদ ডলার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। অর্থাৎ, এই সিদ্ধান্তের প্রভাবে মার্কিন ডলারই হয়ে দাঁড়ায় সোনার বিকল্প এবং আন্তর্জাতিক "রিজার্ভ কারেন্সি" বা মজুদ মুদ্রা।

কিন্তু আমেরিকা তার কথা রাখেনি। অতিরিক্ত মার্কিন ডলার ছাপানোর ফলে স্বর্ণের বিপরীতে ডলারের দাম হু-হু করে পড়তে থাকে। এমনকি ১৯৭১ সালে মার্কিন ডলারের দাম প্রতি আউন্স স্বর্ণের বিপরীতে ২০০ তে নেমে আসে।
ডলারের এই পড়তি দামের প্রেক্ষিতে ইয়োরোপের দেশগুলোর অসয়টি বাড়তে থাকে। তারা তাদের মজুদ করা ডলার ভাঙিয়ে স্বর্ণ দাবি করে বসে আমেরিকার কাছে। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের শুরুতে ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জেস পম্পিদিউ ডলার ভাঙিয়ে নিরাপদে সোনা নেওয়ার জন্য আমেরিকাতে একটি যুদ্ধ জাহাজ পাঠান।

আগস্টের ১১ তারিখ তৎকালীন ব্রিটিশ ট্রেজারি অনুরোধ করে যে, আমেরিকা যেন ব্রিটেনের পাওনা ৩ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ স্বর্ণ ফোর্ট নক্স থেকে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে নিয়ে রাখে। সেই সময়ে আমেরিকা নিজের স্বর্ণ রাখত ফোর্ট নক্সে আর অন্য দেশের স্বর্ণ রাখত নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে। আমেরিকা অনুরোধ শুনেই বুঝে ফেলে যে ব্রিটেন, যাদের সাথে বসে তারা ব্রেটন উডস চুক্তি করেছে, তারাই এখন স্বর্ণ উঠিয়ে নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক সেই সময়ই ১৫ই আগস্ট পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে, তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন স্বর্ণের মজুদ ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করে দেন।

এই এক ঘোষণার ফলে মার্কিন ডলার এবং তার সাথে সাথে পৃথিবীর সকল মুদ্রা ফিয়াট কারেন্সিতে পরিণত হয়। বর্তমানে বিশ্বের কোনো দেশের মুদ্রার বিপরীতে মূল্যবান সম্পদ জমা রাখা নেই। মুদ্রা এখন নিজেই নিজের মূল্যমান।

ঋণের টাকা

শুনতে অবাক হলেও সত্য যে বর্তমান মুদ্রা ব্যবস্থায় টাকার অপর নাম ঋণ। একটি রাষ্ট্রে কোনো ঋণ নেই মানে সেই দেশে কোনো টাকাও নেই। ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে।

ধরা যাক, আপনার হাতে ৩ লক্ষ টাকা অলস পড়ে আছে। ঘরে টাকা রাখা অনিরাপদ ভেবে আপনি সততা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে টাকাটা জমা রাখলেন। অতঃপর একদিন এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী প্রদীপ সাহেব সততা ব্যাংক থেকে ২.৫ লক্ষ টাকার ঋণ নিলেন। ঋণ নিয়ে সেই টাকায় তিনি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করে দিলেন।
এখন যদি শ্রমিকদের প্রশ্ন করা হয় আপনাদের নিকট কত টাকা আছে?

তারা গণনা করে বলবে আড়াই লক্ষ টাকা। কিন্তু যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় আপনার কত টাকা আছে। আপনিও বলবেন সততা ব্যাংকে আমার ৩ লক্ষ টাকা আছে, চাইলেই তোলা যাবে অথবা টাকা না হলেও চেকে বা কার্ডে কেনাকাটা করা যাবে। অর্থাৎ, উভয় পক্ষের হিসেবমতে আপনাদের মোট টাকার পরিমাণ ৫.৫ লক্ষ। কিন্তু টাকা তো ছিলই ৩ লক্ষ!

তারপরে শ্রমিকরা যখন বিভিন্ন পণ্য যেমন লাক্স সাবান, মোবাইল ফোন ইত্যাদি কিনবে তখন সেই ২.৫ লক্ষ টাকা পুনরায় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে নতুন কোনো (বা আগের) ব্যাংকে জমা হবে এবং সেই ব্যাংক তা পুনরায় ঋণ হিসেবে দিয়ে দেবে। ধরা যাক শ্রমিকদের ২.৫ টাকার মোট ২.২ লক্ষ টাকা আবার ব্যাংকে প্রবেশ করল। ব্যাংক কিছু টাকা রিজার্ভে রেখে ২ লক্ষ টাকা পুনরায় ঋণ দিয়ে দিল। পরে সেই টাকা ঘুরে ফিরে আবারো ব্যাংকে ফেরত আসল এবং ব্যাংক

তা আবারো ঋণ দিল। এভাবে ব্যাংক ব্যালেন্স এবং ঋণের পরিমাণ চক্রাকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অর্থনীতিবিদদের মতে ব্যাংক ব্যালেন্স এবং কাগুজে মুদ্রা উভয়ই টাকা। কেউ যদি দেউলিয়া না হয়ে যায়, ব্যাংক আপনার এবং অন্যান্য সকল ডিপোজিটরের টাকা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেবে। একই সময় ব্যাংক ব্যালেন্সের বিপরীতে আপনি যেকোনো কেনাকাটা করতে পারেন। অর্থাৎ, ব্যাংক ব্যালেন্সই টাকা।

অর্থনীতির পরিভাষায় কাগুজে মুদ্রাকে এম ০ এবং ব্যাংক ব্যালেন্সসহ সকল মুদ্রাকে এম ১ বলা হয় এবং এম ১ এর সাথে ফিক্সড ডিপোজিট ব্যালেন্স যোগ করে হিসেব করা হয় এম ২। বাস্তবে দেখা যায় উন্নত বিশ্বে এক টাকা কাগুজে মুদ্রার বিপরীতে প্রায় ১০ টাকা ঋণ এবং ব্যাংক ব্যালেন্স তৈরি হয়। অর্থাৎ, আপনার ৩ লক্ষ টাকা ব্যাংকিং সিস্টেমের জাদুতে পরিণত হয় ৩০ লক্ষ টাকায়।

এখন আপনি ভাবতে পারেন, প্রথমে আপনার হাতে যেই কাগুজে টাকাটা (এম ০) ছিল তা তো ঋণ মুক্ত ছিল। কিন্তু না; বাংলাদেশ সরকার, ব্রিটিশ সরকার বা আমেরিকান সরকার যখন রাস্তা, সেতু ও হাসপাতাল তৈরি করে, তখন টাকশালে টাকা ছাপিয়ে ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। শুধু বাংলাদেশ,ব্রিটেন কিংবা আমেরিকা নয়, বর্তমান বিশ্বে প্রায় সব দেশের সরকারই টাকা বা ডলার ছাপাতে পারে না, সরকার কেবলমাত্র কর এবং শুল্ক আদায় করে ব্যয়ভার বহন করে। যদি কোনো বছরের আয় সেই বছরের ব্যয় অপেক্ষা কম হয়, সরকার তখন ঋণ গ্রহণ করে। আবার যদি কোনো বছরের আয়, ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়, বাড়তি অর্থে সরকার পূর্বের ঋণ শোধ করে অথবা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। কিন্তু টাকা ছাপিয়ে সরকার কিছুই করতে পারে না। টাকার মালিক হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে সরকারকে দান করে না। এই টাকা সরকারকে এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ দেয় এবং সেই ঋণের টাকা ঘুরে ফিরে আমাদের হাতে আসে। অর্থাৎ, বর্তমান অর্থ ব্যবস্থায় সব টাকাই ঋণ। তাই সবাই নিজ নিজ ঋণ শোধ করে দিলে দেশে কোনো টাকাই থাকে না।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

আলুর বাম্পার ফলন হলে আমরা কি আলুর বাজারদরে পরিবর্তন লক্ষ করি?
অবশ্যই।
আলুর ফলন বেড়ে গেলে আলুর দাম কমে যায়। সেই হিসেবে দেশে মোট উৎপাদন বেড়ে গেলে সব পণ্য ও সেবার দাম গড়পরতা কমে যাবার কথা ছিল। কিন্তু এমন না হয়ে দেখা যায় জিডিপি যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন?
অসঙ্গতিটি ব্যাখ্যা করা যাক। তার আগে চিন্তা করে দেখুন, কোনো দেশেরর মুদ্রা যদি আলু হয়, আলুর দাম কমে গেলে কি বাকি সব জিনিসের দাম বেড়ে যাবে না? নিশ্চয়ই বেড়ে যাবে কারণ আলুই যদি মুদ্রা হয় এবং মুদ্রা তার মূল্যমান হারিয়ে ফেলে তাহলে সবকিছুর দাম স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যাবে।

ব্যাপারটি বুঝতে পারলে একটু চিন্তা করে দেখুন, নতুন টাকা বেশি দেশি ছাপা হলে অর্থনীতিতে মোট টাকার পরিমাণ বেড়ে যাবে। সবকিছু আগের মতো থাকলে কোনো বস্তু পরিমাণে বেড়ে গেলে সেই বস্তুটির বাজার মূল্য কমে যায়। তাই বেশি বেশি টাকা ছাপা হলে টাকার মূল্যমান কমে যাবে এবং টাকার মূল্যমান কমে যাওয়ার সাথে সাথে সবকিছুর দাম বেড়ে যাবে। অর্থাৎ, নতুন টাকা 'বেশি' ছাপানো হলে সবকিছুর দাম বেড়ে যায়। তাই জিডিপি বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যমূল্য কমার কথা হলেও মোট টাকার পরিমাণ জিডিপি বৃদ্ধির তুলনায় অধিক হারে বাড়লে, সব জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যাবে। এটি হচ্ছে মূল্যস্ফীতির প্রধান কারণ। তবে এছাড়াও মূল্যস্ফীতির বেশ কিছু সাময়িক কারণ আছে। একটি হচ্ছে পণ্য সংকট। মনে করুন, ইউক্রেন, রাশিয়া যুদ্ধের কারণে গম পরিবহনে সমস্যা হচ্ছে। গ্রাহকদের পক্ষ থেকে গমের চাহিদা আগের মতোই থাকলে বাজারে পণ্য সংকট দেখা দেবে। কারণ দুইজন গ্রাহক যদি একই পণ্যের জন্য দোকানে ভিড় করে, তাহলে বিক্রেতা কার কাছে তা বিক্রি করবে? অবশ্যই যেই গ্রাহক অধিক মূল্যে পণ্যটি ক্রয় করতে আগ্রহী হবে তার কাছে। এভাবে স্বভাবসুলভ পণ্যটির দাম বেড়ে যাবে। এজন্যই কোনো পণ্যের সংকট সৃষ্টি হলে তার বাজারমূল্য বেড়ে যায়।

মূল্যস্ফীতির আরেকটি কারণ হতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। উদাহরণ স্বরূপ থাইল্যান্ড (শ্যামদেশ) হচ্ছে কম্পিউটার হার্ড ডিস্ক তৈরির অন্যতম প্রধান জায়গা। ২০১১ সালে শ্যামদেশে তীব্র বন্যা হয়, যার ফলে হার্ড ডিস্ক উৎপাদন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তখনও আন্তর্জাতিক বাজারে হার্ড ডিস্কের চাহিদা আগের মতোই ছিল। তাই সারা বিশ্বে হার্ড ডিস্কের দাম বেড়ে যায়। উৎপাদন ব্যাহত হয়ে দাম বৃদ্ধি পাওয়ার এই সকল ঘটনাকে ইংরেজিতে বলে Supply Shock যা আমরা প্রায়ই দেখে থাকি।

মূল্যস্ফীতির আরেকটি কারণ হতে পারে স্পেকুলেশন বা উচাল। মনে করেন বাজারে হঠাৎ করে বাড়ি কেনার ধুম পড়ল। সবাই যার যা সঞ্চয় আছে তা দিয়ে বাড়ি কেনা শুরু করল ২০০৭ সালের বিশ্ব মন্দার আগে ঠিক এমনটিই হয়েছিল। তখন দেখা যাবে বাড়ির দাম, গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর দাম ও জমির দাম বেড়ে গেছে। এভাবে উচাল বা স্পেকুলেশনের ফলেও জিনিসপত্রের দাম বাড়তে পারে। এছাড়া গুদামজাতকরণ, কর ও শুল্কসহ নানাবিধ মানবসৃষ্ট কারণেও মূল্যস্ফীতি হতে পারে।

মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতি

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মান ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণ

আমাদের অনেকের মনে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খায় যে, "এক এক দেশের মুদ্রার মান এক এক রকম হয় কেন? এর সাথে অর্থনৈতিক উন্নতির কোনো সম্পর্ক আছে কি?"

সত্যি কথা বলতে অর্থনীতির সাথে মুদ্রামানের স্থায়ী কোনো সম্পর্ক নেই। এই অংশটি লেখা কালে আমেরিকান ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বাজার মূল্য ছিল ৯০ টাকা। কিন্তু একই সময় নরওয়েজিয়ান ক্রোনার বিপরীতে টাকার বাজার মূল্য ছিল প্রায় ১০ টাকা। অথচ আমেরিকার তুলনায় নরওয়ে উন্নত রাষ্ট্র। নরওয়ের মাথা পিছু আয় আমেরিকার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। সেই হিসেবে ক্রোনার বাজার মূল্য ডলার অপেক্ষা বেশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এমনটি হচ্ছে না কেন? উত্তরে আপনি হয়তো ভেবে থাকবেন নরওয়ে উন্নত রাষ্ট্র হলেও এর আকৃতি খুব ছোট। আমেরিকার অর্থনীতি সেই তুলনায় অনেক বড়। তাছাড়া প্রযুক্তিগতভাবেও আমেরিকা উন্নত। শিল্পে ও গবেষণাতেও আমেরিকা সমৃদ্ধ। সেই হিসেবে ডলারের মূল্য ক্রোনার চাইতে বেশি হওয়াটা স্বাভাবিক। আপনি যদি এমনটাই ভেবে থাকুন তাহলে আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বর্তমানে জাপানি মুদ্রার বাজার মূল্য ৫০ পয়সা। অর্থাৎ, জাপানি ইয়েন বাংলাদেশি টাকার চেয়ে সস্তা। আর দক্ষিণ কোরিয়ার টাকার মূল্য মাত্র তিন পয়সার সমান। অর্থাৎ, এক বাংলাদেশি টাকায় ৩৩ কোরিয়ান টাকা পাওয়া যাবে। তার মানে কি এই যে বাংলাদেশ কোরিয়া বা জাপানের তুলনায় শিল্পে সমৃদ্ধ এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী?

এক্ষেত্রে অনেকের মনে হতে পারে জনসংখ্যার সাথে টাকার মানের কোনো সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই ধারণটাও ভুল। মোট জনসংখ্যার সাথেও মুদ্রার মানের কোনো সম্পর্ক নেই। মধ্যপ্রাচ্যের দিকে চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাব কুয়েতের এক দিনারের মূল্য ২৫০ টাকা। কিন্তু সৌদি আরব কুয়েতের চেয়ে অনেক বড়, আরও জনবহুল এবং অধিক সম্পদশালী। তারপরেও সৌদি রিয়ালের মূল্য কুয়েতি দিনারের তুলনায় ১০ গুণ কম। এমনকি মার্কিন ডলার

বা চীনা ইউয়ানও কুয়েতি দিনারের চেয়ে কম মূল্যবান। তার মানে মুদ্রামানের সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে এক এক দেশের মুদ্রার মান এক এক রকম কেন?

ঐতিহাসিকভাবেই পৃথিবীর এক এক দেশের মুদ্রার মান এক এক রকম।

আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, "একটি গ্রাম বড় কিন্তু অন্য গ্রাম ছোট কেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে আপনি হয়তো বলবেন এভাবেই সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে; আগের থেকেই এমন ইত্যাদি। মুদ্রার ব্যাপারটাও ঠিক তেমন। এক এক দেশের মুদ্রার মান এক এক রকম ঐতিহাসিকভাবেই। এর সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জনসংখ্যা, প্রযুক্তি বা কূটনৈতিক শক্তির কোনো যোগসূত্র নেই।

আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যেকোনো রাষ্ট্র চাইলেই মুদ্রার মান পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। কাল যদি ঘোষণা আসে, বাংলাদেশের নাগরিকদের যার হাতে যত টাকা আছে সবাই তা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যেককে দশ গুণ টাকা ফেরত দেবে, এতে জীবনে কোনো কিছুই বদলাবে না বরং সব কিছু আগের মতোই থাকবে, অতিরিক্ত একটি শূন্য ছাড়া। বিষয়গুলো আরো গভীরে কিভাবে কাজ করে এবং এই পরিবর্তনগুলোর প্রভাব কী কী তা চিন্তা করার গুরুত্বপূর্ণ জগৎ।

ব্যাংকব্যবস্থা

ব্যাংক

ছোট থাকতে আমাদের সকলেরইছোট বড় মাটির ব্যাংক ছিল হয়তো। সেখানে আমরা আমাদের কাঁচা টাকা অথবা নতুন টাকা গুলো সঞ্চয় করে রাখতাম। অর্থাৎ যেই টাকাটার এখন কোন প্রয়োজন নেই সেটা ব্যাংকের জমিয়ে রাখতাম। পরে প্রয়োজনের সময় অথবা নিজের কোন শখের জিনিস কেনার সময় সেই টাকা বের করতাম।

এখন ধরুন রহিমের কাছে একটা ব্যাংক আছে এবং সেখানে তার ৫ হাজারের মত টাকা আছে। একদিন তার মা তাকে বলল ১০ হাজার টাকা আছে এই টাকাটা তুমি তোমার ব্যাংকে রেখে দাও। কারণ এখন এই টাকার আমার তেমন প্রয়োজন নেই। টাকাটা ব্যাংকে রাখার কিছুদিন পর ওই তার বাবার হঠাৎ ৫০০০০ টাকা একসাথে প্রয়োজন হল । কোন জায়গায় জোগাড় করতে না পেরে সে ব্যাপারটা রহিমকে জানালো।

রহিম একটু চিন্তা-ভাবনা করে বলল, বাবা আমার ব্যাংকে কিছু টাকা জমা আছে। এই টাকাটা তুমি আপাতত ধার নাও। পরে সুযোগ মতো পরিশোধ করে দিও।

রহিমের এই কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এবং সুদের ভিত্তিতে হলে, তাকে বলে ব্যাংক। ব্যাংক এক হাত দিয়ে মানুষের থেকে টাকা নেয় এবং আরেক হাত দিয়ে মানুষকে ঋণ দেয়। এই দুই দেওয়া নেওয়ার পার্থক্য থেকেই ব্যাংক সুদের হারের তফাতে লাভ করে।

ইসলামি ব্যাংক

আপনি যখন সাধারণ একটি ব্যাংকের থেকে ঋণ নিতে যান, ব্যাংক তখন আপনাকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে শর্ত জুড়ে দেয়, "৩০ লক্ষ টাকা ফেরত দিতে হবে। প্রতি বছর ৬ লক্ষ টাকা করে পাঁচ বছরে সমাপ্ত।"

কিন্তু একই উদ্দেশ্যে আপনি যখন একটি ইসলামি ব্যাংকের কাছে যান তখন তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে "কী প্রয়োজনে ঋণ নিতে চান?"

আপনি হয়তো বলেন, "একটি গাড়ি কিনতে টাকা প্রয়োজন।"

তারা তখন আপনাকে বলে, "আচ্ছা আমরা আপনাকে ২০ লক্ষ টাকার গাড়ি কিনে দিচ্ছি। তবে, আপনি আমাদেরকে ৩০ লক্ষ টাকা ফেরত দেবেন। কারণ গাড়িটি আমরা আপনার কাছে ৩০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেব। আপনি এই টাকা আগামী ৫ বছরে আমাদের ফেরত দেবেন।"

এই পদ্ধতিটির নামই 'মুরাবাহা'। সুচিন্তিত পাঠক মনে মনে ভাবতে পারেন কিছু কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? দুই জনই তো ৩০ লক্ষ টাকা ফেরত নিচ্ছে পাঁচ বছরে। অর্থনৈতিকভাবে এই দুটি লেনদেনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে একটি সুদ এবং অপরটি ব্যবসা হয় কী করে?

ইসলামি ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে যুক্তি প্রদান করা হয়, অন্যান্য ব্যাংকগুলো সরাসরি টাকা দিয়ে বাড়তি ফেরত চায়। যেহেতু ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত নেওয়াটা সুদ, সেটা হারাম। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকগুলো যেহেত ২০ লাব টাকার মাল ৩০ লাখ টাকায় বিক্রি করে বাড়তি টাকা নিচ্ছে, এটা ব্যবসা। ব্যবসা করে লাভ করা যেহেতু হালাল তাই এটা হালার।

ছোট একটি গল্পের মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক।

একজন স্বপ্নবাজ তরুলের নাম সিন্দাবাদ। সিন্দাবাদ স্বপ্ন দেখে একদিন সে জাহাজে করে সাগর পথ পাড়ি দিয়ে দেশ-বিদেশে ব্যবসা করবে। কিন্তু জাহাজ কেনার সামর্থ্য তার ছিল না। তারপরেও সিন্দাবাদ হাল ছাড়বার পাত্র ছিল না। স্বপ্ন পূরণ করা তার চাই-ই চাই। উপায়ান্তর না দেখে সিন্দাবাদ। গেল কেহেরমানের কাছে।

কেহেরমান সিন্দাবাসের উদ্যোগের কথা শুনে খুব খুশি হলো এবং সাহায্য করতে রাজি হলো, তবে বিনা লাভে নয়। এদিকে কেহেরমান সাহেব ছিল মুসলিম। ইসলামি আইনে টাকা ধার দিয়ে বেশি নিলে সুদ হয়ে যাবে। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে সে মোক্ষম একটি বুদ্ধি বের করল। হাতে হাতে ১ কোটি টাকা না দিয়ে পরিচিত কোনো ব্যক্তিকে (বা সিন্দাবাদকেই) হুকুম দিল ১ কোটি টাকার একটি জাহাজ কেহেরমানের নামে কিনতে। জাহাজ কেনা হলো। এর মালিক কেহেরমান। এবার জাহাজটি সিন্দাবাদের কাছে বিক্রয় করল ২ কোটি টাকায়। সিন্দাবাদকে এই টাকা ৭ বছরের কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার এই চর্চার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মহলের বেশ কিছু অভিযোগ আছে। একটি অভিযোগ হচ্ছে এই যে ইসলামি ব্যাংক প্রকৃত ব্যবসায়ী না। আপনি যদি কোনো ইসলামি ব্যাংককে বলেন, "আপনি তো আমার কাছে জাহাজ বিক্রি করছেন, আপনার ট্রেড লাইসেন্সটা দেখি। ব্যাংক বলবে, "কী যা তা বলছেন। আমি কেবল টাকা লেনদেন করি। জাহাজ বিক্রির লাইসেন্স কোথা থেকে পাব" অর্থাৎ, ইসলামি ব্যাংকগুলো প্রকৃত ব্যবসায়ী না। তারা ব্যবসা করছে কেবল 'কাগজে-কলমে'।

এই ব্যাপারে আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে ইসলামি ব্যাংকগুলো লাভক্ষতিতে অংশ নেয় না। সিন্দাবাদ জাহাজ কেনার পর যদি এটি ডুবে যায়, তাতে কেহেরমানের কিছু যায় আসে না। কারণ তিনি মাল বিক্রি করে দিয়েছেন, কেহেরমান ব্যবসার অংশীদার নয়। তাই লাভ লোকসানের কোনো ভাগ কেহেরমান নেবে না। জাহাজ চালিয়ে সিন্দাবাদ যদি সুবিধা করতে না পারে তাতেও কেহেরমানের কিছু যায় আসে না। প্রয়োজন বোধে সিন্দাবাদকে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করে হলেও পাওনা টাকা দিতে হবে। এক কথায় সাধারণ ব্যাংকের থেকে ঋণ নেওয়ার তুলনায় কেহেরমানের থেকে ঋণ নেওয়াতে সিন্দাবাদের অর্থনৈতিক জীবনে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

ইসলামি ব্যাংকিং-এর ব্যাপারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী অভিযোগ হলো 'টাকা তৈরি' করা বা ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং'। ধরুন, আপনার কাছে ১০০ টাকা আছে। আপনি ২০ টাকা সরিয়ে রেখে বাকি ৮০ টাকা ঋণ দিবেন এমনটাই স্বাভাবিক। এটাকে বলে 'ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং।'

কিন্তু যদি আপনি ৪ জন গ্রাহককে বলেন, 'তোমাদেরকে ১০০ টাকা করে দেব।' তারপর এই ৪ জন ৪০০ টাকা খরচের লাইসেন্স পেয়ে যায়, কিন্তু আপনার কাছে আছে মাত্র ১০০ টাকা, এই সিস্টেমটাকে বলে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং'। অর্থাৎ, এই ব্যবস্থায় আপনি এমন একটা টাকা বানালেন, যেটার মালিক আপনি নিজেও না। ব্যাংক এই কাজ করতে পারে এবং এই

হাওয়াই টাকা সুদে আসলে ঋণ দিতে পারে । বলা চলে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা চলছেই 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং' নীতিতে।' ইসলামি ব্যাংকও এর চর্চা করছে এবং নিজেও স্বীকার করেছে।"

এতসব অভিযোগকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ইসলামি ব্যাংকগুলো দেদারচে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই ব্যাপারে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নীরব ভূমিকা পালন করছে। এমনকি ইসলামের ব্যাপারে উদাসীন সংস্থা যেমন, বিশ্বব্যাংক নিজেও ইসলামি ব্যাংকের প্রচার প্রসারে ভূমিকা পালন করেছে বলে তথ্য রয়েছে। সেই সকল বিতর্কে না জড়িয়ে এখন চলুন আরেকটি বিশেষ ব্যাংক সম্পর্কে আমরা জানি যার নাম আপনারা সবাই শুনেছেন।

বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংক শব্দটি শুনলে আপনাদের মনে হতে পারে এটি বিশ্বের সবগুলো ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কিন্তু ধারণাটি মোটেও সঠিক নয়। বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন উন্নয়নখাতে ঋণ প্রদানকারী একটি উন্নয়নমূলক ব্যাংক। এখানে আন্তর্জাতিক লেনদেন বা মুদ্রানীতি সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রমই হয় না। এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথেও এর কোনো সম্পর্ক নেই। সকল ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলতে কিছু যদি থেকে থাকে তা হচ্ছে আইএমএফ। তাহলে বিশ্ব ব্যাংকের কাজ কী? এবং এর নাম বিশ্বব্যাংক কেন?

১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস সম্মেলনে The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) বা আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক এবং International Monetary Fund (IMF) বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল নামে দুটি প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করে। IBRD-র লক্ষ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইয়োরোপের পুনর্গঠন। তাই IBRD-র প্রথম ঋণ গ্রহণকারী দেশ ছিল ফ্রান্স। ১৯৪৭ সালে ফ্রান্স IBRD থেকে ২৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহণ করে। সেই সময় ইয়োরোপের অন্য পিছিয়ে পড়া দেশসমূহকে সাহায্য করার পাশাপাশি IBRD-র আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল মার্শাল প্ল্যান বাস্তবায়ন করা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে পশ্চিমা দেশগুলোকে সমৃদ্ধ করার জন্য যেই পরিকল্পনা নেওয়া হয় তার নামই হচ্ছে মার্শাল প্ল্যান। তবে ধীরে ধীরে IBRD তাদের কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী ছড়াতে থাকে এবং বর্তমান অবস্থায় রূপ নেয়।

বিশ্বব্যাংকের থেকে বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের সরকার চাইলে ঋণ নিতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রদানের সাথে বিভিন্ন প্রকার শর্ত জুড়ে দেয় যেমন- নারী ক্ষমতায়ন,

অর্থনীতি আন্তর্জাতিকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালুকরণ ইত্যাদি। কোনো ঋণগ্রহীতাই শর্ত পছন্দ করে না। সরকারও না। সেই হিসেবে বিশ্বব্যাংকের ঋণ কেউ নিতে চাওয়ার কথা না। তারপরেও উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্বব্যাংকের ঋণ পেতে আবেদন করে। তার কারণ কী? একটি কারণ হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের ঋণে সুদের হার অনেক কম। এত অল্প সুদে ঋণ পাওয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কষ্টকর। তাই সরকার বিশ্বব্যাংকের শর্তে রাজি হয়ে যায়। এভাবে বিশ্বব্যাংক তাদের মিশন বিশ্বজুড়ে বাস্তবায়ন করে।

বিশ্বব্যাংক সরাসরি সরকারকের হাতে টাকা দেয় না। তারা কেবলমাত্র নিজেদের পছন্দসই প্রজেক্টে ঋণ দেয়। যেমন ২০১৩ সালে বিশ্বব্যাংকের ঋণের সিংহভাগ ছিল সড়ক এবং সেতুকেন্দ্রিক, তারপরে ছিল বিশুদ্ধ পানি, শিক্ষা, নারী অধিকার, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি। যারা যারা এই খাতগুলোতে কাজ করে বিশ্বব্যাংক তাদেরকে ট্রেনিং এবং কন্সাল্টেন্সি (পরামর্শ) সেবাও প্রদান করে। আবার অনেক সময় বিশ্বব্যাংক তাদের নিজস্ব প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব দেয় সরকারকে। এর বিনিময়ে তারা সহজ শর্তে ঋণ দেয়। এছাড়াও বিশ্বব্যাংক বেসরকারি খাতে ঋণ দিতে পারে। সব মিলিয়ে বিশ্বব্যাংক হচ্ছে একটি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। এর পূর্ব নাম The International Bank for Reconstruction and Development বা আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক ছিল বাস্তবতার সাথে অধিক প্রাসঙ্গিক। এই ব্যাংকের ১৮৯ সদস্য রাষ্ট্রের প্রত্যেকের ভোটাধিকার আছে। তবে আমেরিকার ভোটাধিকার একক সর্বোচ্চ এবং এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট সবসময় আমেরিকা থেকেই হয়ে এসেছে।

বিশ্বব্যাংক টাকা উত্তোলনের জন্য বাজারে বন্ড ছাড়ে। আরেকটি মজার ব্যাপার হচ্ছে, আপনি চাইলে নিজেও বিশ্বব্যাংকের বন্ড কিনতে পারেন। তবে ঋণ বিফলে যাবার সম্ভাবনা খুব কম হওয়াতে এই বন্ডগুলোতে সুদের হার খুব কম থাকে। এর পাশাপাশি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর থেকে বিশ্বব্যাংক ফি নেয় এবঙ অনুদানও পায়। এভাবে তারা পর্যাপ্ত টাকা জোগাড় করে বিশ্বব্যাপী ঋণ দিয়ে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে।
আন্তর্জাতিক অর্থনীতি

রিজার্ভ

পত্রিকা খুললেই আমরা দেখতে পারি আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ এত বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে, আবার তার কিছুদিন বাসে দেখি রিজার্ভ অত বিলিয়ন ডলার কমে গেছে ইত্যাদি। কিন্তু এই ফরেক্স রিজার্ভটা কী?

মনে করুন, সাবানা এবং পূর্ণিমা দুইজনই বাংলাদেশে থাকে। তারা যখন নিজেদের মধ্যে কেনাকাটা করবে যেমন সাবানা তার ভাই জসিমের জন্য পূর্ণিমার দোকান থেকে একটি পাঞ্জাবি কিনবে তখন তারা কোন মুদ্রা ব্যবহার করবে? উত্তর হচ্ছে টাকা। কারণ বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্তে টাকাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিনিময় মাধ্যম।

কিন্তু আমরা যখন ভিন্ন দুইটি দেশের সাথে বাণিজ্য করি বা বিদেশ ভ্রমণে যাই, তখন দেশীয় মুদ্রা ব্যবহার করতে পারি না। যেমন, ধনাঢ্য রাজিব সাহেব যখন ব্রিটেন থেকে একটি রোলস রয়েলস গাড়ি কিনবেন রোলস রয়েলস কোম্পানিকে বাংলাদেশি টাকার একটি ব্রিফকেস ধরিয়ে দিলে ফলাফল কী দাঁড়াবে? এক কথায় রোলস রয়েলস কোম্পানি মহা ফ্যাসাদে পড়বে। এই টাকা দিয়ে কোম্পানি তাদের শ্রমিকদের বেতন বা ট্যাক্স কিছুই দিতে পারবে না। কারণ ব্রিটেনে বাংলাদেশি টাকা চলে না, সেখানে চলে পাউন্ড। তাই গাড়ি কিনতে রাজিব সাহেবের প্রয়োজন হবে পাউন্ড।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে পাউন্ড তৈরি হয় না। বাংলাদেশ তো দূরের কথা, খোদ ব্রিটেন বাদে আর কোনো দেশই পাউন্ড তৈরি করতে পারে না। রাজিব সাহেব যদি টাকার বিপরীতে পাউন্ড কিনতে যান হয়তো তিনি কোনো গ্রাহকও পাবেন না। কারণ একজন ব্রিটিশ ব্যক্তি যখন পাউন্ড বিক্রি করে টাকা কিনবেন তিনি এই টাকা কোনো কাজে লাগাতে পারবেন না (যদি না তিনি বাংলাদেশ থেকে কিছু ক্রয় করেন অথবা বাংলাদেশে ভ্রমণ করেন)।

অপরপক্ষে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক যখন আমরা ইয়োরোপে রপ্তানি করি তখন আমরা অর্জন করি ইয়োরো। কিন্তু ইয়োরো দিয়ে দেশের বাজারে কেনাকাটা করা বা শ্রমিকের বেতন পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। অপর দিকে একজন ইয়োরোপীয় ক্রেতার পক্ষেও বাংলাদেশি টাকা অর্জন করা সবসময় সম্ভব হয় না। এর ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেনে মুদ্রার ভিন্নতা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

এই সমস্যা দূর করতে আগেকার দিনে আন্তর্জাতিক লেনদেনে ব্যবহার করা হতো সোনা। কোনো দেশ পণ্য রপ্তানি করলে সেই দেশের কোষাগারে সোনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেত। আবার

আমদানি করার সময় কোষাগার থেকে সোনা খরচ করতে হতো। এভাবে সোনার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি পেত।

কিন্তু সমস্যা বেঁধে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। তখন ইয়োরোপীয় দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ঋণী হয়ে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ হারিয়ে ফেলে। তাই তাদের দ্বারা টাকার বিপরীতে সোনা মজুদ করে রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠে না। এর প্রেক্ষিতে ১৯৪৪ সালে আমেরিকার ব্রেটন উডসে একটি চুক্তির মাধ্যমে নতুন নিয়ম জারি করা হলো। একমাত্র মার্কিন ডলারের বিপরীতে সোনা মজুদ থাকবে আর বাদবাকি সকল মুদ্রা ডলারের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখবে। এভাবে মার্কিন ডলার হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাধারণ মুদ্রা।

তখন থেকেই দুটি ভিন্ন দেশ তাদের নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য করত ডলারে (কারণ তাদের হাতে প্রয়োজনীয় স্বর্ণ ছিল না এবং ডলারের বিপরীতেই কেবল স্বর্ণ মজুদ ছিল)। এক কথায় ব্রেটন উডস চুক্তির পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলার হয়ে উঠল নতুন স্বর্ণ।

পরবর্তীকালে আমেরিকা তার প্রতিশ্রুতি রাখেনি। তারা চুক্তির উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত ডলার ছাপাতে থাকে। এই ব্যাপারে অভিযোগ উঠলে ১৯৭১ সালে সবাইকে অবাক করে দিয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ডলারের বিপরীতে সোনার মজুদ ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করেন।
এইভাবে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড-এর ইতি ঘটে। বর্তমানে কোনো মুদ্রার বিপরীতের আর সোনা মজুদ নেই।

কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্যের জন্যে একটি সাধারণ মুদ্রা থাকা প্রয়োজন, যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। সেই গ্রহণযোগ্য সাধারণ মুদ্রার রাজ-আসন ব্রেটন উডস-এর কল্যাণে দখল করে আছে মার্কিন ডলার। তার কোনো দেশ যখন রপ্তানি করে বা রেমিট্যান্স অর্জন করে তখন সেই আয় হয় ডলারে। আবার কোনো দেশ যখন আমদানি করে তখন সেই ব্যয় হয় ডলারে। আর এই দুয়ের পার্থক্য কোষাগার থেকে যোগ বিয়োগ করে নিতে হয়।

একটি পরিবারের আয় অপেক্ষা ব্যয় কম হলে যেমন সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, ঠিক তেমনি একটি রাষ্ট্রের ডলার আয় অপেক্ষা ডলার ব্যয় কম হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। আর এই সঞ্চয়কেই ইংরেজিতে বলে রিজার্ভ। অনেক সময় একে ফরেক্স রিজার্ভও বলা হয়ে থাকে। ফরেক্স শব্দের অর্থ হচ্ছে ফরেইন এক্সচেঞ্জ বা বৈদেশিক লেনদেন। যেহেতু আমরা বৈদেশিক লেনদেনের মাধ্যমে এই সঞ্চয় বা রিজার্ভ অর্জন করেছি তাই একে বলি ফরেক্স রিজার্ভ।

রিজার্ভ যে সবসময় ডলারেই থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনি আমি চাইলেই যেমন একটি সম্পদ বিক্রি করে অন্যান্য সম্পদে রূপান্তর করতে পারি, ঠিক তেমনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকও চাইলে ডলার বিক্রি করে অন্যান্য সম্পদ কিনে রাখতে পারে। এজন্য অনেক সময়ই কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভে বৈচিত্র্য আনতে ডলার বিক্রি করে ইয়োরো, ইয়েন, স্বর্ণ ইত্যাদি কিনে রাখে। এই সকল সম্পদের সম্মিলিত বাজার সরকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ বলে।

প্রচলিত অর্থব্যবস্থা

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোন দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলী যেমন: উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, বিনিয়োগ, বিনিময়, বাণিজ্যের ধরন প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক ও আইনগত রীতিনীতি গড়ে ওঠে। বর্তমান বিশ্বে যেসব অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে, তার ছোট-খাট পার্থক্য বাদ দিলে বলা চলে, মোট তিন প্রকার অর্থব্যবস্থা বিশ্বে চালু আছে। আর তা হ'ল-

1. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা
2. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
3. ইসলামী অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে আধুনিক পুঁজিবাদী বা ধনতন্ত্রবাদের (Capitalism) উৎপত্তি হয়। ইংল্যান্ডে ১৭৬০-১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ শিল্প বিপ্লবের বিকাশ হ'লেও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের পর এর দ্রুত বিকাশ ঘটে। ফ্রান্স ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে শিল্প বিপ্লবের দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে যে বিরাট সম্পদের ও মূলধনের সৃষ্টি হয়, তা মুষ্টিমেয় মালিক শ্রেণীর হাতে থাকার ফলে ধনতন্ত্রের উৎপত্তি হয়। শিল্প বিপ্লবের আগে আধুনিক কলকারখানা না থাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা কুটির শিল্পের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। কুটির শিল্পে যে ব্যক্তি উৎপাদক সেই ব্যক্তি শিল্প দ্রব্যের মালিক হওয়ায় শোষণের সম্ভাবনা ছিল না। বিক্রিত মালের মূল্য উৎপাদকই পেত। শিল্প বিপ্লবের ফলে কল-কারখানা স্থাপিত হ'লে কুটির শিল্প ধ্বংস হয়। শিল্প উৎপাদন কারখানাগুলোতে কেন্দ্রীভূত হয়। যাদের হাতে মূলধন ছিল তারা কারখানা স্থাপন করে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের মুনাফায় ফেঁপে উঠে। এভাবে এক পুঁজিবাদী শ্রেণীর উদ্ভব হয়।[6] ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে সংঘটিত শিল্প-বিপ্লবই আধুনিক ধনতান্ত্রিক ধারণার জননী। বৃটেনের শিল্প

বিপ্লবের পূর্বে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তেমন পরিচিতি ছিল না।[7] পুঁজিবাদের ইতিহাস বৈচিত্র্যময় এবং এর বহু বিতর্কিত বিষয় রয়েছে, তবে সাধারণত সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত নিমণ দেশগুলোতে (বর্তমানে ফ্ল্যান্ডারস এবং নেদারল্যান্ড) এবং গ্রেট ব্রিটেনে, ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্থিত বলে মনে করা হয়।[8]
সর্বোপরি অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমগ্র ইউরোপে ধনতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। একই সময়ে অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর অনুসারীরা এ অর্থনীতির দৃঢ় প্রবক্তা ও সমর্থক হিসাবে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, ডেনমার্ক, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালী, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।
ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানা (Private ownership) নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ থাকে না। যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ বা সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত অবাধ মূল্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজার পরিচালিত হয়, তা ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনরূপ হস্তক্ষেপ থাকে না। Capitalism is an economic system where private entities own the factors of production.[14] পুঁজিবাদ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাগুলো উৎপাদনের উপকরণের মালিক হয়।
অর্থনীতিবিদ জে. এফ. র‍্যাগান ও এল. বি. থমাস বলেন, 'Pure Capitalism is characterized by Private ownership of resources and by reliance on market, in which buyers and sellers come together and determine what quantities of goods and resources are sold and at what price'.[15] বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র হচ্ছে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা এবং বাজারের উপর আস্থা যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা একত্রে নির্ধারণ করে কি দামে ও কি পরিমাণে দ্রব্য ও সম্পদ বিক্রি হবে।
অতএব পুঁজিবাদী অর্থনীতি সম্পদের ব্যক্তিমালকানার উপর নির্ভরশীল। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোকে ব্যক্তিগত মালিকানায় যেকোন পরিমাণ অর্থের যোগান দিয়ে শিল্প কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারে। শিল্প কারখানার মালিক সর্বাধিক মুনাফা লাভের আশায় তার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধি করাই মানুষের সকল প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

এ ব্যবস্থায় আল্লাহকে আকাশে স্বীকার করা হয় যমীনে নয়।

১। সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা আছে।

২। মীরাসি আইন সম্পর্কে নীরব।

৩। একের উপার্জিত অর্থে অন্যের কোন পাওনা নেই।

৪। সহায়-সম্বলহীনদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই। এ কারণেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দেশে সর্বহারা ও ভিক্ষুক জন্ম নেয়।

৫। সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের মাধ্যমে সীমাহীন শোষণের সুযোগ আছে ফলে এ সমাজে ভিক্ষুক ও সর্বহারার সংখ্যা শুধু বাড়তেই থাকে।

৬। আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ে কোন বাধা-নিষেধ নেই।

৭। সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার সুযোগ আছে।

৮। জাতীয় সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফভিত্তিক বণ্টনের কোন আইন বা বাধ্য-বাধকতা নেই।

৯। একই রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আয়ের কোন সীমা নির্ধারীত নেই।

১০। পণ্যদ্রব্য গোলাজাত করে রেখে মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ আছে।

১১। অহেতুক ও অপব্যয়ের সীমাহীন সুযোগ আছে। এবং

১২। জাতীয় ধনভান্ডারে দেশের জনগণের সমঅধিকার শুধু মুখে বা কাগজে-কলমে স্বীকার করা হয় বটে কিন্তু বাস্তবে তা মানা হয় না।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

সোস্যলিজম' শব্দটি ১৮২৭ সালে ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) কো-অপারেটিভ ম্যাগাজিনে প্রথম ব্যবহার করেন।[9] জার্মান বংশোদ্ভূত কার্ল মার্কস ও ইংল্যান্ডের অধিবাসী এঙ্গেলস্-এর যুগান্তকারী লেখা ‘কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো’ ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিপ্লব জেগে উঠতে শুরু করে। এরই ফলে বিশ্বে সর্বপ্রথম রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে জারতন্ত্রের পতন ও লেলিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের উত্থান হয়। পরবর্তীতে বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ ‘মাও-সে-তুং’ এর নেতৃত্বে চীনেও এ অর্থব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটে।[10] উদ্ভবের পর থেকে সমাজতন্ত্র বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে। যেমন উইকিপিডিয়াতে বলা হয়েছে,

...সমাজতন্ত্র চারটি সময়কাল পেরিয়েছে : প্রথমটি হয়েছিল ঊনিশ শতকে ইউরোপীয় দর্শন (১৭৮০-১৮৫০)। তারপরে ঊনিশ শতকে কর্পোরেশন এবং শিল্পায়ন উত্থানের প্রাথমিক বিরোধী হিসাবে (১৮৩০-১৯১৬) বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের উত্থান ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নের চতুর্দিকে সমাজতন্ত্রের উৎস এবং সমাজতান্ত্রিক বা সামাজিক

গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া (১৯১৬-১৯৮৯); নয়া-উদার যুগে সমাজতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া (১৯৯০-)। সমাজতন্ত্রের বিকাশ যেমন হয়েছিল, তেমনি অর্থনীতিতেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল।[11]

সর্বোপরি পুঁজিবাদের শোষণ, সম্পদের বৈষম্য সৃষ্টি, অপরিকল্পিত উৎপাদন এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধ এবং সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে কার্ল মার্কস-এর যুগান্তকারী গ্রন্থ Das Kapital (Capital) প্রকাশিত হওয়ার পর এবং তাঁর তত্ত্বের আলোকে ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সারা বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক মতবাদ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে রাশিয়া, চীন, কিউবা, জার্মানী, পোল্যান্ড, উত্তর কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যামান। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ন্যায় ব্যক্তিমালিকানায় অর্থনৈতিক কোনরূপ সম্পদ থাকে না। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ওপর ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত থাকে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (Central Planning Authority) কর্তৃক দেশের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়। অর্থনীতিবিদ জে. এফ. র‍্যাগান ও এল. বি. থমাস বলেন, 'Socialistic Economy: an economic system in which property is publicly owned and central authorities co-ordinate economic decisions'.[16] সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হ'ল এরূপ একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পল এ. স্যামুয়েলসনের মতে, ‘Socialism refers to the government ownership of the means of production, planning by the government and income distribution.[17] সমাজতন্ত্র বলতে বুঝায় উৎপাদনের সরকারী মালিকানা, সরকারী পরিকল্পনা এবং আয় বণ্টন। কেউ কেউ বলেন, Socialism is a populist economic and political system based on public ownership (also known as collective or common ownership) of the means of production.[18] সমাজতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় (যদিও সমষ্টিগত বা সাধারণ মালিকানা হিসাবে পরিচিত) উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে একটি জনবহুল অর্থনৈতিক ও রাজনেতিক ব্যবস্থা।

অতএব যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালিত হয় তা হ'ল সমাজতন্ত্র। এ অর্থব্যবস্থা মনে করে, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ করে। সমতাভিত্তিক বণ্টন এবং শোষণ নির্মূল করার জন্য সমাজতন্ত্র মতবাদটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

সমাজতন্ত্রীক অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি

এ ব্যবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করা হয় না। এর মূলনীতিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ। যথা-

১। সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা নেই।

২। মীরাসি আইনের কোন বালাই নেই।

৩। এ ব্যবস্থায় শ্রম আছে কিন্তু উপার্জন নেই। প্রয়োজন মুতাবিক পাওনা স্বীকার করা হয় কিন্তু উপার্জনের মাধ্যমে কোন সঞ্চয়ের সুযোগ নেই। কাজেই প্রয়োজন মুতাবিক পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করার কোন পথ নেই এবং ভিক্ষুকদের কিছু ভিক্ষা দেয়ার মত অর্থ কারও হাতে থাকে না। মানুষ পশুর মত পরিশ্রম করে পশুর মত খেতে পায়।

৪। যে ব্যক্তি শ্রমে অক্ষম সে হয় সব ধরনের মৌলিক অধিকার থেকে মাহরূম বা বঞ্চিত। তার বাঁচার অধিকার ত্যাগ করতে হয়।

৫। এতে সুদ নেই। কারণ এ সমাজে ব্যবসায়ে সাধারণের কোন মালিকানা নেই। কাজেই সুদের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৬। আয় ও ব্যয় সবই রাষ্ট্রের, এটা কোন ব্যক্তির নয়। আর সঞ্চয়ের কোন বালাই নেই এ ব্যবস্থায়।

৭। সম্পদ সবই রাষ্ট্রনায়কদের কুক্ষিগত।

৮। জাতীয় সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কোন ইনসাফভিত্তিক আইন নেই এবং জনগণের জৈব প্রয়োজন ছাড়া মানবসুলভ কোন নৈতিক প্রয়োজনকে এ সমাজে স্বীকার করা হয় না।

৯। একই রাষ্ট্রের সব শ্রেণীর নাগরিকদের একই প্রকার পাওনা বা মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হয় না।

১০। পণ্যদ্রব্যসহ যাবতীয় উৎপাদিত দ্রব্যের একমাত্র মালিকানা সরকারের। ক

১১। রাষ্ট্রনায়কদের অহেতুক ব্যয়ের সীমাহীন সুযোগ আছে।

১২। জাতীয় ধনভান্ডারে ধনবানের অধিকার স্বীকার করা হয় কিন্তু সে

ইসলামী অর্থব্যবস্থা :

ইসলাম একটি শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যা প্রচলিত অর্থব্যবস্থার মারাত্মক সংকট উত্তরণে একটি সর্বোত্তম অর্থব্যবস্থা হিসাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির সমন্বয় সাধন করে আদর্শ অর্থনীতির প্রবর্তন করে।

ইসলামী স্বর্ণযুগে ৬২২-৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী অর্থনীতির সূচনা হয়েছিল, যখন মহানবী (সা) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন অর্থনীতিতে 'ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযোগিতা' চর্চা করেছিলেন। উম্মাহ একই আচরণবিধির আওতায় পরিচালিত হয়েছিল এবং উচ্চ মানের জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য

সম্পদ দক্ষতার সাথে বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটা বিশ্বাস করা হয় যখন ইসলামের সূচনা ঘটে, তখন ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

মানুষের সমগ্র জীবনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি ব্যবস্থা হ'ল ইসলাম। সমগ্র জীবন অর্থ তার ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, আর্থিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন- সবকিছুই।[12]

ইসলামী অর্থশাস্ত্র প্রচলিত অর্থশাস্ত্র থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। যা দ্বারা এ বিশ্ব অর্থনীতির ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উভয়ই কল্যাণকর কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। যে অর্থব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিভাবে আয়, উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, মূলধন ও বিনিয়োগ প্রভৃতি পরিচালিত হয়, তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থা। ড. এস.এম. হাসানুয্যামান বলেন, “Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the Shariah that prevent injustice in the acquisition and disposal of meterail resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society.”[13] ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে শরী'আতের বিধিনির্দেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তার প্রয়োগ, যা বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অবিচার প্রতিরোধে সমর্থ, যেন এর ফলে মানবমন্ডলীর সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। ফলে আল্লাহ ও সমাজের প্রতি তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে।

অতএব ইসলামী শরী'আতের বিধিনির্দেশ অনুযায়ী মানুষের প্রয়োজন অনুসারে উপার্জন, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মানবীয় কল্যাণ সাধন, ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন, ভোগ, সামাজিক নিরাপত্তা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সকলের জীবিকার নিশ্চিয়তার বিধান প্রণালীকে ইসলামী অর্থনীতি বলে।

ইসলামী অর্শ ব্যবস্থার নীতিগত দিক

এ ব্যবস্থায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র বিধানদাতা হিসেবে স্বীকার করা হয়।

১। সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা আছে।

২। মীরাসি আইনের মাধ্যমে একের সম্পদ অন্যের মালিকানায় যাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

৩। একের উপার্জিত অর্থে অন্যের পাওনা আছে।

৪। যাকাত, ছদকা, ফিতরা, দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জনে অক্ষমদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে। কাজেই এ সমাজে ভিক্ষুক ও সর্বহারা হওয়ার কোন পথ নেই।

৫। সুদের মাধ্যমে শোষণের কোন সুযোগ নেই।

৬। আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ে বাধা-নিষেধ আছে।

৭। সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার কোন সুযোগ নেই।

৮। জাতীয় সম্পদ বন্টনে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই।

৯। একই রাষ্ট্রের মধ্যে মাথাপিছু সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আয়ের সীমা নির্ধারিত আছে। সীমাহীনভাবে অর্থ উপার্জন ও অর্থ কুক্ষিগত করে রাখার কোন চোরা পথ এতে খোলা নেই।

১০। পণ্যদ্রব্য গোলাজাত করে রেখে মূল্য বৃদ্ধির কোন অধিকার নেই।

১১। অহেতুক অর্থ ব্যয়ের অপব্যয়ের এবং অপচয়ের দ্বার চিরতরে বন্ধ।

১২। জাতীয় তহবিলের অর্থকে এ সমাজে আল্লাহ্র সম্পদ ও জনগণের আমানত মনে করা হয়। কাজেই যারা তার রক্ষক ও পাহারাদার তারা কখনও মনে করে না যে, ঐ অর্থে তাদের কোন অতিরিক্ত হিস্যা আছে।

এগুলো হচ্ছে মোটামুটিভাবে ইসলামী অর্থব্যবস্থার অতি সংক্ষিপ্ত

অর্থনৈতিক সমস্যা আসলে কি?

আমরা যদি পরিভাষাগত এবং শাস্ত্রীয় জটিলতার ধূম্রজালকে একপাশে রেখে একেবারে সহজ, সরল ও সাধারণভাবে দেখি তাহলে সহজেই মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত রূপ বুঝতে পারি। সমাজের বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির ধারা অব্যাহত রেখে কিভাবে মানুষের অপরিহার্য জীবন সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়: কিভাবে সমাজের প্রতিটি মানুষকে তার সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী উন্নত করা যায় এবং কিভাবে তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে যোগ্যতার চরম শিখরে পৌঁছার সুযোগ করে দেয়া যায়, আসলে তা-ই হলো মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলকথা। সুপ্রাচীনকালে মানুষের জীবিকার বিষয়টি ছিলো পশুপাখির জীবিকার মতোই সহজ ও জটিলতামুক্ত। আল্লাহর এ যমীনে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সীমাসংখ্যাহীন জীবন সামগ্রী। প্রতিটি সৃষ্টির জন্যে যা প্রয়োজন তার তুলনায় জীবিকার সরবরাহ ছিল অঢেল ও অগাধ। প্রত্যেকেই স্বীয় জীবিকার অন্বেষণে বের হতো আর পৃথিবীর ভাণ্ডার থেকে তা সংগ্রহ করে নিত। এজন্যে কাউকেও মূল্য পরিশোধ করতে হতো না। এক সৃষ্টির জীবিকা অপর সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধও ছিল না। প্রাচীনতমকালে মানুষের অবস্থাও প্রায় এ রকমই ছিলো। সে সময়ে মানুষ বেরিয়ে পড়তো আর প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করে নিতো নিজের প্রায়োজনীয় জীবিকা। এসব রুজি ছিল ফল মূল ও শিকার করা পশুপাখি। সে সময়ে মানুষ প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে ঢেকে নিতো নিজেদের শরীর। পৃথিবীর বুকে যেখানেই সুযোগ সুবিধা দেখতো, সেখানেই মাথা গোঁজার জন্যে জায়গা বানিয়ে নিতো।

কিন্তু এ অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকার জন্যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ মানুষের মধ্যে এমন সৃজনশীল প্রতিভা ও আকাঙ্ক্ষা অন্তর্নিহিত করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ব্যষ্টিক ও স্বতন্ত্র জীবন যাপনের রীতি পরিত্যাগ করে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের প্রক্রিয়া অবলম্বন এবং নিজের কর্মকৌশলের মাধ্যমে প্রকৃতির সরবরাহকৃত উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের জীবন উপকরণকে আরো উন্নত করার প্রয়াস পেয়েছে। নারী পুরুষের মাঝে স্থায়ী সম্পর্কের প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষা, মানব শিশুর দীর্ঘ সময় ধরে মা-বাবার প্রতিপালনের মুখাপেক্ষী হওয়া, নিজ সন্তান-সন্ততি ও বংশের প্রতি মানুষের গভীর আকর্ষণ এবং রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রতি মহব্বত ভালবাসা এসব প্রবণতা মানব প্রকৃতিতে এমনভাবে নিহিত রাখা হয়েছে যাতে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। একইরূপে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত উপকরণে তুষ্ট না হয়ে কৃষি কাজের মাধ্যমে নিজের খাদ্য উৎপাদন, পত্রপল্লব দিয়ে দেহ আবৃত করার পরিবর্তে নিজের জন্যে শিল্পসম্মত পোশাক তৈরি, গুহায় থাকার উপর সন্তুষ্ট না থেকে ঘরবাড়ী বানানো এবং নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে দৈহিক যন্ত্রপাতির উপর তুষ্ট না হয়ে লোহা, পাথর, কাঠ ইত্যাদির সাহায্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা ইত্যাদি সবই প্রকৃতি মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত করে দিয়েছে। এরই অপরিহার্য ফল স্বরূপ মানুষ ধীরে ধীরে সমাজবদ্ধ

হয়েছে। এটা মানুষের কোনো অপরাধ নয়; বরঞ্চ এ-ই ছিলো মানব প্রকৃতির দাবী এবং সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা।

সামাজিক জীবনে প্রবেশের সাথে সাথে মানুষের জন্যে কিছু বিষয় অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। সে বিষয়গুলো হচ্ছে:

এক: ধীরে ধীরে মানুষের জীবনোপকরণের চাহিদা বেড়ে গেল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের যাবতীয় চাহিদা নিজেই পুরণ করতে অসমর্থ হয়ে পড়লো। ফলে একজনের কিছু চাহিদা অন্যদের সাথে এবং অন্যদের কিছু চাহিদা তার সাথে সম্পর্কিত হলো এবং মানুষ পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লো।

দুই: জীবন যাপনের অপরিহার্য সামগ্রীক বিনিময় (Exchange) রীতি চালু করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে বিনিময়ের একটি মাধ্যম (Medium of Exchange) নির্দিষ্ট হলো।

তিনঃ প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী তৈরি করার জন্যে যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হলো এবং চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে মানুষ নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার এবং তা থেকে উপকৃত হতে লাগলো।

চার: এসবের সাথে সাথে মানুষ এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাইলো যে, নিজের শ্রমের মাধ্যমে সে যেসব জিনিস লাভ করেছে, যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে সে কাজ করছে, যে জমিতে সে ঘর বানিয়েছে এবং যেখানে সে নিজের পেশাগত কাজ করছে, সে সবকিছুই যেনো তার অধিকারে থাকে এবং তার মৃত্যুর পর ঐসব লোকেরাই যেনো এসবের স্বত্বাধিকারী হয়, যারা অন্যদের তুলনায় তার অধিকতর নিকটবর্তী।

এভাবে বিভিন্ন পেশার জন্য হয়, ক্রয়-বিক্রয় ও দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ রীতি চালু হয়, মূল্য নিরূপণের মানদণ্ড হিসেবে মুদ্রার প্রচলন হয়, আন্তজ 'িিতক আদান প্রদান এবং আমদানী রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টি হয়, নতুন নতুন উৎপাদন উপকরণ (Means of Production) আবিষ্কৃত হয় এবং স্বত্বাধিকার ও উত্তরাধিকার রীতি চালু হয়। এসবই ছিলো স্বাভাবিক এবং প্রকৃতির দাবী এবং এগুলোর মধ্যে কোনোটিই গুনাহর কাজ ছিল না যে, এখন তার জন্যে তাওবা করতে হবে। এছাড়া মানব সমাজের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোও অপরিহার্য হয়ে পড়ে:

১. মানুষের শক্তি সামর্থ এবং যোগ্যতা প্রতিভার ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ যে পার্থক্য রেখে দিয়েছেন, তার ফলশ্রুতিতে কিছু মানুষ তার প্রকৃত চাহিদার চেয়ে অধিক উপার্জনে সক্ষম হওয়া, কিছু লোক চাহিদা মেটানোর মতো উপার্জন করা এবং আর কিছু লোক নিজেদের চাহিদা পূরণ করার মতো উপার্জন করতে না পারা স্বাভাবিক ছিল।

২. উত্তরাধিকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পত্তির কারণে কিছু লোকের জীবনের সূচনাই অগাধ উপায় উপকরণের মধ্যে হওয়া, কিছু লোক স্বল্প উপায় উপকরণ নিয়ে যাত্রা শুরু করা এবং আর কিছু লোক সহায় সম্বলহীন অবস্থায় নিঃসম্বল হয়ে জীবন যুদ্ধে নামাও অপরিহার্য ছিল।

৩. প্রাকৃতিক কার্যকারণেই প্রতিটি জনবসতিতে এমন কিছু লোকও বর্তমান থাকা স্বাভাবিক ছিল যারা জীবিকা উপার্জনের কাজে অংশগ্রহণে অযোগ্য এবং বিনিময়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী সংগ্রহ করতেও অক্ষম। যেমন: শিশু, বৃদ্ধ, রোগী, অক্ষম প্রভৃতি।

৪. এছাড়া প্রত্যেক সমাজে এমন কিছু লোক থাকা স্বাভাবিক ছিল যারা সেবা গ্রহণ করবে, আর কিছু লোক থাকবে যারা সেবা প্রদান করবে। এভাবেই সৃষ্টি হবে স্বাধীন শিল্প কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য; চালু হবে অপরের চাকুরী করা এবং শ্রম বিনিময়ের প্রতি মানব সমাজে এসবই ঘটেছে স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক কার্যকারণে। এসব অবস্থা সংগঠিত হবার কারণে এমন কোনো অন্যায় বা অপরাধ হয়নি যে, এখন সেগুলোকে উচ্ছেদের চিন্তা করতে হবে। সামাজিক বিপর্যয় ও বিকৃতির অন্যান্য কারণ থেকে যেসব অনিষ্ট সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়ে বহুলোক ঘাবড়ে যায়। ফলে কখনো ব্যক্তি মালিকানাকে, কখনো অর্থকড়িকে, কখনো যন্ত্রপাতিকে, কখনো মানুষের মধ্যে বিরাজমান স্বাভাবিক অসামাকে এবং কখনোবা সমাজকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু আসলে এটা ভ্রান্ত মূল্যায়ন এবং রোগ ও ওষুধ নিরূপণের ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। মানব প্রকৃতির দাবী অনুসারে যে সামাজিক বিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে সমাজ কাঠামো যে রূপ পরিগ্রহ করে, তা প্রতিহত করার চেষ্টা করা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। এরূপ চেষ্টায় সাফল্যের তুলনায় ধ্বংস ও অনিষ্টের আশংকাই অধিক। কিভাবে সামাজিক উন্নয়ন প্রতিহত করা যায়, কিংবা কিভাবে স্বাভাবিক রূপ কাঠামোকে পাল্টানো যায় মানুষের আসল অর্থনৈতিক সমস্যা এটা নয়। বরঞ্চ তার আসল অর্থনৈতিক সমস্যা হলো, সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সামাজিক যুলম অবিচার কিভাবে প্রতিহত করা যায়। 'প্রতিটি সৃষ্টি তার জীবিকা লাভ করুক'-প্রকৃতির এ উদ্দেশ্য কিভাবে পূর্ণ করা যায় এবং কিভাবেই বা সেসব প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়, যেগুলোর কারণে কেবল উপায় উপকরণ নেই বলে অসংখ্য মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রতিভা বিনষ্ট হয়ে যায়; মূলত এগুলো হচ্ছে মানুষের সত্যিকার অর্থনৈতিক সমস্যা।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আসল কারণ

এবার আমরা দেখবো, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সত্যিকার কারণ কি আর এ বিকৃতি ও বিপর্যয়ের ধরনই বা কি?

মূলত, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সূচনা হয় স্বার্থপরতার ক্ষেত্রে বেপরোয়া সীমালংঘন থেকে। অতপর অন্যান্য নৈতিক অসাধুতা এবং ভ্রান্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাহায্যে এ বিকৃতি-বিপর্যয় আরো বৃদ্ধি এবং প্রসার লাভ করে। এমনকি, তা গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে জীবনের অন্যান্য বিভাগেও তার বিষাক্ত ছোবল সম্প্রসারিত করে থাকে। আমি একটু আগেই বলেছি, ব্যক্তি মালিকানা এবং কিছু লোকের তুলনায় অপর কিছু লোকের আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়া মূলত প্রকৃতিরই দাবী এবং অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা মূলত কোনো প্রকার অনিষ্টের কারণ নয়। মানুষের সকল নৈতিক গুণবৈশিষ্ট্য যদি সুসামঞ্জস্যের সাথে কাজ করার সুযোগ পায় আর বাইরেও যদি ইনসাফ ও সুবিচার ভিত্তিক একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে এ দুটি জিনিস থেকে কোনো প্রকার অনিষ্ট সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু স্বাভাবিক কারণে যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল তাদের স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি, অনিষ্ট চিন্তা, কার্পণ্য, লোভ-লালসা, দুর্নীতি এবং প্রবৃত্তিপূজার ফলে এগুলোকে অনিষ্ট সৃষ্টির কারণ বানিয়ে দিয়েছে। শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিয়ে বুঝিয়েছে যে, প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে অধিক যেসব অর্থসামগ্রী তোমাদের হাতে আসে এবং যেগুলো তোমাদের মালিকানাভুক্ত হয়, সেগুলো ব্যয়-বিনিয়োগের সঠিক এবং যুক্তিসংগত খাত হলো দুটি: এক, সেগুলো নিজের আরাম আয়েশ, বিলাসিতা, আনন্দ স্ফুর্তি এবং সুখ স্বাচ্ছন্দের কাজে ব্যয় করবে। আর দ্বিতীয় হলো, আরো অধিক অর্থসামগ্রীর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে সেগুলোকে বিনিয়োগ করবে এবং সম্ভব হলে এগুলোর মাধ্যমে মানুষের প্রভু এবং অন্নদাতা হয়ে বসবে।

প্রবৃত্তিপূজা এবং বিলাসিতা

শয়তানের এ পয়লা শিক্ষার পরিণতি এই দাঁড়ালো যে, সম্পদশালী সমাজের সেসব লোকের অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করলো যারা বঞ্চিত কিংবা যারা প্রয়োজনের তুলনায় কম সম্পদ লাভ করেছে। তারা এ লোকগুলোকে ক্ষুধা, দারিদ্র ও দূরবস্থায় নিক্ষেপ করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করলো না। নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে তারা একথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলো যে, তাদের আচরণের ফলে সমাজের বহু মানুষ অপরাধের কাজে লিপ্ত হতে পারে, অনেকে নৈতিক অধঃপতনের গহ্বরে নিমজ্জিত হতে পারে এবং শারীরিক দুর্বলতা ও রোগব্যাধির শিকার হতে পারে। ফলে তারা তাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি ও যোগ্যতা প্রতিভা বিকশিত করা এবং সমাজ সভ্যতার উন্নতিতে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। এতে সামষ্টিকভাবে সেই সমাজটিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ধনীগণ নিজেরাও যার অংশ। সমাজের বিত্তশালী

সদস্যরা এতোটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ এরা নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজনের উপর আরো অসংখ্য প্রয়োজনকে সংযোজন করে নিয়েছে। আর নিজেদের দুষ্ট প্রবৃত্তির মনগড়া এসব উদা কামনা বাসনা পূরণের জন্যে তারা এমন অসংখ্য মানুষকে নিয়োজিত করেছে যাদের যোগ্যতা প্রতিভা সমাজ সভ্যতার কল্যাণময় সেবায় ব্যবহৃত হতে পারতো। জ্বিনা-ব্যভিচারকে তারা নিজেদের জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ বানিয়ে নিয়েছে। আর এ লালসা চরিতার্থ করার জন্য তারা অসংখা নারীকে দেহব্যবসা ও রূপ-যৌবনের বিপণি সাজাতে বাধ্য করলো। গানবাজনাকে তারা তাদের অপরিহার্য প্রয়োজনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেদিল। এজন্যে তৈরি করা হলো গায়ক-গায়িকা, নর্তকী এবং বাদকদের দল বহু লোককে নিয়োগ করা হলো এ বাদ্যযন্ত্র তৈরির কাজে। তাদের আনন্দ-স্ফূর্তি ও চিত্তবিনোদনের জন্য নানা ধরনের ভাঁড়, রসিক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, গাল্পিক, অংকনশিল্পী, চিত্রশিল্পী এবং অন্যান্য অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় পেশা ও পেশাদারের জন্ম হলো। এসব ধনশালীদের বিলাস চরিতার্থ করার জন্যে অগণিত লোককে ভালো ও কল্যাণময় কাজের পরিবর্তে বনের পশুপাখি তাড়িয়ে ফেরার কাজে নিযুক্ত করা হয়। তাদের আনন্দ-স্ফূর্তি ও নেশার প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে অসংখ্য মানব সন্তানকে নিয়োগ করা হয় মদ, কোকেন, আফিম এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য তৈরি ও সরবরাহের কাজে। মোটকথা, এভাবে শয়তানের এসব সাথীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে সমাজের একটি বিরটি অংশকে শুধুমাত্র নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক ফাংসের গহ্বরে নিমজ্জিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ আরো অগ্রসর হয়ে সমাজের আরেকটি বড় অংশকে সঠিক ও কল্যাণময় কাজ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে অর্থহীন, অপমানকর ও ক্ষতিকর কাজে নিযুক্ত করেছিল। সমাজের গতিকে এর সঠিক ও ন্যায়সংগত পথ থেকে বিচ্যুত করে এমন পথে পরিচালিত করলো, যা মানবতাকে নিয়ে যায় ধ্বংসের অতল গহ্বরে। সম্পদশালীদের যুলম, অবিচার ও ধ্বংসাত্মক কার্যধারার এখানেই শেষ নয়। তারা কেবল মানবীয় মূলধনকে (Human Capital) অপচয় ও ধ্বংস করেছে তাই নয়। বরং সেই সাথে তারা বস্তুগত মূলধনকেও ভ্রান্ত পথে বিনিয়োগ ও ব্যয় ব্যবহার করেছে। নিজেদের প্রয়োজনে তারা বড় বড় প্রাসাদ, অন্দরমহল, গুলবাগিচা, প্রমোদকুঞ্জ, নৃত্যশালা, নাট্যশালা, প্রেক্ষাগার এমনকি মরার পর সমাধির জন্যও তারা বিরাট ভূমিখণ্ডের উপর জাঁকজমকপূর্ণ সমাধিসৌধ নির্মাণ করে নিল। এভাবে আল্লাহর অসংখ্য বান্দার বাসস্থান ও জীবিকার জন্যে যে জমি ও দ্রব্যসামগ্রী কাজে লাগাতে পারতো, তা মাত্র গুটিকয়েক বিলাসী ব্যক্তির পৃথিবীতে জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থান ও বিদায়ের ব্যবস্থা করার জন্যে ব্যয় করা হলো। দামী দামী অলংকার, মনোরম পোশাক, উঁচুদরের সাজসজ্জন, সৌন্দর্য ও বিলাসিতার সামগ্রী, জাঁকালো মডেলের যানবাহন এবং আরো অনেক। জানা অজানা বাহারী সামগ্রীর জন্য তারা অঢেল সম্পদ ব্যয় করলো। এমনকি, এসব যালিমরা জানালা দরজায় দামী দামী পর্দা ঝুলালো, ঘরের দেয়ালগুলোতে বহু টাকা ব্যয় করে ছবি ও চিত্র এঁকে নিলো, - ঘরের মেঝেতে বিছিয়ে দিলো হাজার হাজার টাকা মূল্যের কার্পেট ও গালিচা। তারা তাদের কুকুরগুলোকে পর্যন্ত মখমলের পোশাক আর সোনার শিকল পরিয়ে দিলো। এভাবে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী এবং

অসংখ্য মানুষের শ্রম ও সময় যা দুঃস্থ মানুষের দেহাচ্ছাদন ও ক্ষুধা নিবৃত্ত করার কাজে লাগতে পারতো, তা মাত্র গুটিকয়েক বিলাসী ব্যক্তি ও প্রবৃত্তির দাসানুদাসের লালসা চরিতার্থ করার জন্যে নিঃশেষ হয়ে গেলো।

বস্তুপূজা এযাবত যে মারাত্মক চিত্র তুলে ধরলাম, এসবই হলো শয়তানী নেতৃত্বের মাত্র একটি দিকের পরিণতি। শয়তানী নেতৃত্বের অন্য দিকটির পরিণতি এর চেয়েও ভয়াবহ। প্রকৃত প্রয়োজনের অধিক যে সম্পদ ও উপায় উপকরণ কোনো ব্যক্তির হস্তগত হয়েছে, সেগুলোকে 'জমিয়ে রাখবে এবং আরও সম্পদ অর্জনের কাজে বিনিয়োগ করবে' এ নীতি একেবারেই ভ্রান্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যেসব উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তা সৃষ্টিজগত ও মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তোমার হাতে যদি কিছু অধিক অর্থসম্পদ এসে গিয়ে থাকে, তবে জেনে রেখো এটা অপরের অংশই তোমার হাতে এসেছে। তুমি কেন তা জমিয়ে জমিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ছো? তোমার চারপাশে তাকাও, দেখবে যারা তাদের জীবিকা সংগ্রহ করতে অক্ষম, কিংবা যারা তাদের জীবিকা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে, অথবা যারা নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে কম পেয়েছে, মনে করবে এরাই হলো সেইসব লোক যাদের জীবিকার অংশ তোমার হাতে এসে গেছে। তারা তা আহরণ করতে পারেনি; সুতরাং তুমি নিজেই তা ভাদের পৌঁছে দিও। এটাই হচ্ছে সঠিক কর্মনীতি। এর পরিবর্তে তুমি যদি সে সম্পদকে আরো অধিক সম্পদলাভের কাজে ব্যবহার করো তবে তা হবে এক চরম ভ্রান্তি। কেননা এগুলোর সাহায্যে তুমি আরো যতো সম্পদই করবে, তাতো তোমার প্রয়োজনের চাইতে আরো অনেক বেশীই হবে। সুতরাং সম্পদের পর সম্পদলাভ করে সেগুলোর মাধ্যমে তোমার বিকৃত লোভ লালসা আর কামনা বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া কল্যাণকর আর কি হতে পারে। তুমি তোমার সময়, শ্রম এবং যোগ্যতার যতোটা অংশ প্রয়োজনীয় জীবিকালাভের কাজে ব্যয় করো, মূলত ততোটুকুই কেবল এগুলোর সঠিক ও যুক্তিসংগত প্রয়োগ। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদলাভের জন্যে সেগুলোকে কাজে লাগালে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তুমি একটি অর্থনৈতিক পশু, বরং অর্থ উপার্জনের একটি মেশিন ছাড়া আর কিছু নও। অথচ তোমার সময়, শ্রম এবং মানসিক ও দৈহিক যোগ্যতা অর্থ উপার্জনের কাজে প্রয়োগ করা ছাড়াও আরো অনেক মহান ও উত্তম প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে। সুতরাং বিবেক বুদ্ধি ও স্বভাব প্রকৃতির দিক থেকে এ নীতি একেবারেই ভ্রান্ত, যা শয়তান তার শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছে। তাছাড়া এ নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্যে যে কর্মপন্থা তৈরি করা হয়েছে সেটা এতোই অভিশপ্ত এবং এর পরিণাম ফল এতোই ভয়াবহ যে, তা কল্পনা করাও কষ্টকর প্রয়োজনের অধিক অর্থসম্পদকে আরো অধিক অর্থসম্পদ কবজা করার কাজে দুভাবে বিনিয়োগ করা যায় :

এক:সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা;

দুই :ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ করা।

ধরনগত দিক থেকে উভয় পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য অবশ্যি আছে। কিন্তু উভয় পদ্ধতির সমন্বিত কর্মের অনিবার্য পরিণতিতে সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

একটি শ্রেণী হলো তারা, যারা নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী অর্থসম্পদের মালিক হয় এবং সে সম্পদকে আরো বেশী সম্পদ আহরণের কাজে অর্থাৎ সম্পদের পাহাড় গড়ার কাজে বিনিয়োগ করে। এ শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যায় কম হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি হলো তারা, যারা নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজনের সমান বা তার চেয়ে কম অর্থসম্পদের অধিকারী হয়, কিংবা একেবারে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এ শ্রেণীটি সংখ্যায় প্রথমোক্ত শ্রেণীর তুলনায় অনেক বেশী হয়। উভয় শ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী, পরস্পর বিরোধী এবং সাংঘর্ষিক। শুধু তাই নয়, বরং উভয় শ্রেণীর মাঝে সম্পর্ক হয়ে থাকে সংঘাতময়, দ্বন্দ্বমুখর এবং প্রতিবাদী। এভাবেই প্রকৃতি মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যে সুস্থ ও সম্মতিপূর্ণ বিনিময় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা সংঘাত ও শত্রুতামূলক প্রতিদ্বন্দিভার (Antagonistic Compitition) উপর ভিত্তিশীয় হয়ে পড়ে।

প্রতিন্দ্বিতামূলক (ANTAGONISTIC COMPITITION) অর্থব্যবস্থা

অতপর এ সংঘাতময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতোই বাড়তে থাকে, ততোই ধনীক শ্রেণীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং দরিদ্র শ্রেণীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রকৃতিই এমন যে, এতে বিত্তশালীরা তাদের সম্পদের জোরে কম বিত্তের মালিকদের কাছ থেকে সম্পদ চুষে নেয় এবং তাদেরকে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের দলে ঠেলে দেয়। এভাবে দিন দিন বিশ্বের অর্থসম্পদ স্বল্প থেকে স্বল্পতর সংখ্যক লোকের হাতে কুক্ষিগত হতে থাকে এবং অধিক থেকে অধিক লোক দিন দিন নিঃস্ব ও দরিদ্র হয়ে যায় কিংবা ধনীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্রথমদিকে এ সংঘাতের সূচনা হয় স্বল্প পরিসরে। অতপর এর পরিধি বাড়তে বাড়তে দেশ হতে দেশে এবং জাতি হাতে জাতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ক্রমে গোটা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলে। এ প্রক্রিয়া এখানেই শেষ হয় না; এরপরও 'আরও চাই আরও চাই' বলে যেন চিৎকার করতে থাকে। যে প্রক্রিয়ায় এ বৈষম্য সংঘটিত হয়, তাহলো, কোনো একটি দেশের কিছু লোকের হাতে যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসম্পদ থাকে তখন তারা উদ্বৃত্ত অর্থসম্পদকে লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করে এবং এ অর্থ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজে ব্যয় হতে থাকে। এখন তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজি লাভসমেত উঠে আসাটা নির্ভর করে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সে দেশের ভেতরে বিক্রি হওয়ার উপর। কিন্তু বাস্তবে এমনটি সর্বদা হয় না এবং মূলত তা হতে পারেও না। কারন যাদের হাতে প্রয়োজনের চেয়ে কম সম্পদ রয়েছে তাদের জন্য ক্ষমতা তো ক্ষীণই হয়ে থাকে। তাই প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা দরকারী জিনিস ক্রয় করতে পারে না। অপরদিকে যাদের কাছে অতিরিক্ত সম্পদ থাকে তারা তাদের আয়ের একটি বিরাট অংশ

অধিক মুনাফা অর্জন করার কাজে বিনিয়োগ করে। তাই তারা নিজেদের সাকুল্য মূলধন পণ্য ক্রয়ের জন্যে ব্যয় করে না। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর একটি বিরাট অংশ অনিবার্যভাবে অবিক্রিত থেকে যায়। অন্য কথায় এর অর্থ হলো, ধনীদের বিনিয়োগকৃত অর্থের একটি অংশ অনাদায়ী থেকে যায়। এ অর্থ দেশের শিল্পের (Industry) নিকট ঋণ হিসেবে পাওনা থাকে। এ হচ্ছে একটি মাত্র আবর্তনের অবস্থা। এভাবে যতোবারই পুঁজি আবর্তিত হয় ততোবারই পুঁজিপতিরা তাদের লব্ধ আয়ের একটি অংশ আবার লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করবে এবং প্রত্যেক আবর্তনেই অনাদায়ী অর্থের পরিমাণও বাড়তে থাকবে। এভাবে দেশীয় শিল্পের কাছে এ ধরনের ঋণ দ্বিগুণ, চারগুণ, হাজারগুণ বৃদ্ধি পায় যা স্বয়ং সেই রাষ্ট্রের পক্ষেও কখনো আদায় করা সম্ভব হয় না। এ প্রক্রিয়ায় একেকটি দেশ দেউলিয়াত্বের চরম বিপদে নিপতিত হয়। এ অবস্থা থেকে বাঁচার একটিই মাত্র উপায় থাকে। তাহলো, দেশের মধ্যে অবিক্রিত থেকে যাওয়া সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী বহির্বিশ্বে বিক্রির ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ এমন দেশের সন্ধান করা যার ঘাড়ে নিজের দেউলিয়াত্ব চাপিয়ে দেয়া যায়। এভাবেই এ সংঘাতময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ময়দানে পদার্পণ করে। একথা স্পষ্ট যে, কেবল একটি মাত্র দেশই শয়তানী অর্থনীতি অনুসারে পরিচালিত হয় না, বরঞ্চ বিশ্বের অসংখ্য দেশে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রত্যেক দেশই নিজেকে দেউলিয়াপনা থেকে বাঁচানোর জন্যে, অন্য কথায় নিজের দেউলিয়াত্ব অপর কোনো দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জন্যে বাধ্য হয়ে পড়েছে। এভাবেই আরম্ভহয় আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দিতা। আর এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কয়েকটি রূপ ধারণ করে।

প্রথমত, প্রত্যেক দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে নিজের দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্যে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। প্রত্যেকেই স্বল্পতম ব্যয়ে অধিক পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। তাই শ্রমিক কর্মচারীদের অত্যন্ত কম পারিশ্রমিক দেয়া হয়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক কারবারে সাধারণ জনগণ এতোটা কম আয় লাভ করে, যা দিয়ে তাদের প্রকৃত প্রয়োজনও পূরণ হয় না।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক দেশ নিজের পরিসীমা ও নিজ প্রভাব বলয়ের অধীন দেশসমূহে অপর দেশের পণ্যসামগ্রী আমদানীর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। নিজের আয়ত্তাধীন সব ধরনের কাঁচামালের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, যাতে অপর কোনো দেশ তা হস্তগত করতে না পারে। এর ফলে শুরু হয় আন্তর্জাতিক দ্বন্দুসংঘাত যার পরিণতিতে বেজে উঠে যুদ্ধের দামামা।

তৃতীয়ত, যেসব দেশ অপর দেশ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া দেউলিয়াত্বের বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, তাদের উপর অসংখ্য লুটেরার দল হিংস্র স্বাপদের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা সে দেশে কেবল নিজ দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রি করে তাই নয় বরং নিজ দেশে যেসব ধনসম্পদ লাভজনক কাজে খাটানোর সুযোগ নেই, তাও অধিক মুনাফা লুটার উদ্দেশ্যে সেসব

দেশে বিনিয়োগ করে। শেষ পর্যন্ত এসব দেশেও সেই একই সমস্যা সৃষ্টি হয়, যা প্রথমত নিজ দেশে অর্থ বিনিয়োগকারী দেশগুলোতে সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ যে পরিমাণ অর্থ তারা এসব দেশে বিনিয়োগ করে তা পুরোটা উদ্ধার হয়ে আসে না। আবার এ বিনিয়োগ থেকে যে পরিমাণ আয়ই হাতে আসে তার একটা বড় অংশ তারা অধিকতর লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করে। শেষ পর্যন্ত দেশগুলোর ঘাড়ে ঋণের বোঝা এতোটা বৃদ্ধি পায়, যা গোটা দেশকে নগদ দামে বিক্রি করেও আদায় করা সম্ভব হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এরূপ আবর্তন চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত গোটা বিশ্ব দেউলিয়া হয়ে পড়বে। তখন এ দেউলিয়াত্বের বোঝা চাপিয়ে দেবার মতো কোনো দেশই আর বিশ্বের বুকে অবশিষ্ট থাকবে না। এমনকি শেষ পর্যন্ত অর্থ বিনিয়োগ এবং উদ্বৃত্ত পণ্য চালানোর জন্যে বুধ, বৃহস্পতি কিংবা মংগলগ্রহে ছুটোছুটি করতে হবে বাজারের সন্ধানে।

আরো কতিপয় ব্যবস্থা

এ সর্বগ্রাসী দ্বন্দুসংঘাতের ব্যাংক মালিক, আড়তদার, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র একটি দল গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ এমনভাবে করায়ত্ত করে বসে আছে যে, তাদের মুকাবিলায় সমগ্র বিশ্বের মানবজাতি সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার দৈহিক শ্রম ও মনমস্তিষ্কের যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে স্বাধীনভাবে উপার্জনের কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আল্লাহর এ রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা জীবনসামগ্রী থেকে নিজের অংশ সংগ্রহ করা তার জন্যে একেবারেই দুষ্কর। ছোট ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক এবং সাধারণ কৃষিজীবীদের পক্ষে পরিশ্রম করে প্রয়োজন মেটানোর মতো উপার্জন করার কোনো সুযোগ আজ তার অবশিষ্ট নেই। অর্থনৈতিক জগতের ও অম্পিতিদের গোলাম, চাকর এবং মজুর হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। ওদিকে শিল্পপতি, পুঁজি-মালিক ও ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত স্বল্প জীবিকার বিনিময়ে মানুষের দৈহিক ও মানসিক সকল শক্তি ও যোগ্যতা প্রতিভা এবং গোটা সময় ক্রয় করে নিচ্ছে। ফলে গোটা মানবজাতি এখন নিছক একটি অর্থনৈতিক পশুতে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সংগ্রামের চাপে পড়ে নিজের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক উৎকর্ষ সাধন করা, ক্ষুধা নিবারণের চেয়ে উচ্চতর কোনো উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্যারোপ করা এবং জীবিকার সন্ধান ছাড়া অন্য কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিকে বিকশিত করা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে, এ শয়তানী ব্যবস্থার দরুন অর্থনৈতিক দ্বন্দু সংঘাত এতোই কঠিন রূপ ধারণ করেছে যে, জীবনের অন্যসব দিক ও বিভাগ একেবারেই মুহ্যমান ও অকেজো হয়ে পড়েছে। মানুষের আরো দুর্ভাগ্য যে, বিশ্বের নৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন নীতিও এ শয়তানী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাবে চরমভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সকল দেশে নীতিশাস্ত্রের শিক্ষকবৃন্দ মিতব্যয়িতা ও ব্যয় সংকোচনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ

করছেন যা আয় হবে তার পুরোটা ব্যয় করাকে বোকামী এবং নৈতিক ত্রুটি বলে মনে করা হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, স্বীয় আয়ের কিছু না কিছু অংশ বাঁচিয়ে বা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে, কিংবা বীমা পলিসি ক্রয় অথবা কোনো কোম্পানীর শেয়ার কিনতে হবে। বস্তুত মানবতার জন্যে যা ধ্বংসকর ও মারাত্মক, নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিতে তাকেই আজ সত্য ও সৌন্দর্যের মাপকাঠি বানানো হয়েছে।রাষ্ট্রশক্তির কথা আর কি বলবো? বাস্তবে রাজনীতি ও রাষ্ট্রশক্তি পুরোপুরিই শয়তানী ব্যবস্থার করায়ত্ত হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে যুগ্ম ও শোষণ থেকে মানবতাকে রক্ষা করাই ছিল রাষ্ট্রশক্তির দায়িত্ব; কিন্তু আজ স্বয়ং রাষ্ট্রশক্তিই যুগ্ম ও শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। চতুর্দিকে শয়তানের দোসররাই নিরংকুশভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আছে।

একইভাবে বিশ্বের আইনকানুনও এ শয়তানী ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে। এসব আইন কার্যত মানুষকে পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী বানিয়ে দিয়েছে। ফলে মানুষ যেভাবে পারে সমাজ স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যথেচ্ছ চেষ্টা করছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ অবৈধ বাছবিচার প্রায় তিরোহিত হয়ে গেছে। অন্য লোকের সম্পদ শোষণ ও লুণ্ঠন করা কিংবা অন্যকে ধ্বংস করে নিজে অর্থশালী হবার সকল উপায় পন্থাকে আজ আইনের দৃষ্টিতে বৈধ করা হয়েছে। মদ উৎপাদন এবং মদের ব্যবসা, চরিত্রহীনতার আখড়া তৈরি করা, কামোদ্দীপক ফিল্ম বানানো, অশ্লীল ফিচার ও প্রবন্ধ লেখা, যৌন উত্তেজনামূলক ছবি প্রকাশ করা, জুয়ার আড্ডা বসানো, সুদী প্রতিষ্ঠান কায়েম করা, জুয়ার নিত্য নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা, মোটকথা মানবতাকে ধ্বংসকারী যাকিছু করা হোক না কেন, এর কোনোটাই আইন বিরোধী নয়। আইন এসব করার শুধু যে অনুমতি দেয় তাই নয়; বরং এসব করার অধিকার সংরক্ষণের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। অতপর এসব উপায়ে অর্জিত ধনসম্পদ যখন কারো কাছে জমা হয়, তখন তার মৃত্যুর পরও যাতে উক্ত সম্পদ সেখানেই কুক্ষিগত থাকে, আইন তারও ব্যবস্থা করে দেয়।

এজন্যে আইনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার প্রথা (Rule of primogeniture), কোনো কোনো ক্ষেত্রে পালকপুত্র গ্রহণের বিধান এবং যৌথপরিবার প্রথার (Joint family system) ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব আইনের উদ্দেশ্য হলো, ধনভান্ডারের মালিক একটি অজগরের মৃত্যু হলে, আর একটি অজগরকে তার জায়গায় বসিয়ে দেয়া। আর দুর্ভাগ্যবশত সেই অজগর যদি কোনো বাচ্চা রেখে না যায়, তবে অন্যের একটি বাচ্চা ধার করে সেখানে বসিয়ে দেয়া হয়, যাতে সঞ্চিত ধনভাণ্ডার সমাজে ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

৩. মানব মস্তিষ্ক প্রসূত বিভিন্ন ব্যর্থ সমাধান এসব কারণে আজ গোটা মানবজাতির জন্যে সৃষ্টি হয়েছে এক বিরাট জটিল ও দুরূহ সমস্যা। আল্লাহর এ দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন সামগ্রীর ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়, আর প্রতিটি মানুষের সামর্থ্য, যোগ্যতা

ও প্রতিভা অনুযায়ী উন্নতি লাভ এবং স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার সুযোগ করে দেয়ার উপায়ই বা কি হতে পারে তার ব্যবস্থা করাই আজ মূল বিষয়। এ প্রসংগে মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমাধান প্রস্তাব পেশ করেছে।

সমাজতন্ত্রের প্রস্তাবিত সমাধান

সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটি রূপ পরিকল্পনা পেশ করেছে। সমাজতন্ত্রের মতে অর্থসম্পদ ও উৎপাদনের যাবতীয় উপায় উপকরণ ব্যক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জাতীয় মালিকানায় অর্পণ এবং ব্যক্তিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী বণ্টন করার দায়িত্ব সমাজ সংগঠনের উপর ন্যস্ত করাই অর্থনৈতিক সমস্যার যথার্থ সমাধান। বাহ্যদৃষ্টিতে এ সমাধান খুবই যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। কিন্তু এর বাস্তব কার্যকারিতার উপর যতোই গভীর দৃষ্টি ফেলবেন, ততোই এর ত্রুটিসমূহ আপনার কাছে উন্মুক্ত হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আপনি স্বাকীর করতে বাধ্য হবেন যে, যে রোগের চিকিৎসার জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, আসলে সে রোগটির চেয়ে এ ব্যবস্থা অধিক মারাত্মক।
নতুন শ্রেণী

একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট, উৎপাদনের উপায় উপকরণের ব্যবহার এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বণ্টনের ব্যবস্থা তত্ত্বগত দিক থেকে (Theoretically) যতোই গোটা সমাজের হাতে ন্যস্ত করার কথা বলা হোক না কেন, বাস্তবে তা একটি ক্ষুদ্র নির্বাহী সংস্থার (Executive) উপরই একান্তভাবে নির্ভর করতে হবে। প্রথমত এ ক্ষুদ্র দলটি সমাজের (Community) দ্বারাই নির্বাচিত হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু যাবতীয় অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ যখন তাদের করায়ত্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করার কাজ শুরু হবে, তখন অবশ্যই সমাজের প্রতিটি অধিবাসী তাদের মুষ্টিতে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় বন্দী হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় দেশে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করার সাহস পাবে না। তাদেরকে ক্ষমতার মসনদ থেকে হটাতে পারে, এমন সংগঠিত কোনো শক্তিই তাদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে না। কোনো ব্যক্তির উপর থেকে তাদের কৃপাদৃষ্টি উঠে গেলে সেই হতভাগার পক্ষে এ বিশাল পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার মত উপায় উপকরণ পাওয়ার কোনো অধিকারই থাকবে না। কেননা দেশের সমস্ত ধনসম্পদ ও উপায় উপকরণ তো সেই ক্ষুদ্র দলটিরই নিরংকুশ কর্তৃত্বাধীনে আবদ্ধ। তাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বা তা অমান্য করে ধর্মঘট করার দুঃসাহস দেখানো কোনো শ্রমিক মজুরের পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ সেখানে কলকারখানা এবং ক্ষেত খামারের মালিক থাকবে একটিই-একাধিক নয়; কাজেই একজনের কারখানায় অসুবিধা হলে আরেক মালিকের কারখানায় গিয়ে

চাকুরী করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সেখানে সারা দেশের কলকারখানা ও ক্ষেত খামারের মালিক তো কেবল সেই একটি মাত্র ক্ষুদ্র দল। সে আবার রাষ্ট্রক্ষমতারও মালিক। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার জনসমর্থন লাভের সম্ভাবনা থাকবে না। এভাবে এ অর্থনৈতিক রূপ পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত পরিণতি এ দাঁড়াবে যে, সকল ছোট বড় পুঁজিপতি, সকল কলকারখানার মালিক এবং সকল ক্ষেত খামারের অধিকারীদের খতম করে একমাত্র বড় পুঁজিপতি, একমাত্র বৃহৎ কারখানা মালিক ও একমাত্র বিরাট জমিদার সারা দেশের উপর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে জেঁকে বসবে। বস্তুত এ বিরাট শক্তিধর দলটি একই সাথে 'জার' ও 'কাইজারের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা

এরূপ শক্তি ও প্রভুত্ব এবং এ ধরনের নিরংকুশ কর্তৃত্ব এমন এক জিনিস, যার নেশায় মত্ত হয়ে মানুষ শোষক, অত্যাচারী ও নিপীড়ক না হয়ে পারে না। বিশেষ করে এ ধরনের কর্তৃত্বের অধিকারীরা যদি আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর সামনে একদিন নিজেদের কার্যকলাপের জবাবদিহি করার ধারণায় বিশ্বাসী না হয়, তাহলে তাদের নিপীড়নের আর কোনো সীমা পরিসীমাই থাকে না। তা সত্ত্বেও যদি ধরে নেয়া হয় যে, এরূপ সর্বময় ক্ষমতা করায়ত্ত করার পর এ ক্ষুদ্র দলটি সীমালংঘন করবে না এবং সুবিচারের সাথেই যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে, তথাপিও এ ধরনের একটি ব্যবস্থার অধীনে ব্যক্তির পক্ষে তার ব্যক্তিত্বকে সর্বাংগীন বিকশিত করার কোনো সুযোগ থাকতে পারে না। ব্যক্তিত্বকে উন্নতি ও ক্রমবিকাশ দান করার জন্যে মানুষের প্রয়োজন স্বাধীনতা। প্রয়োজন কিছু উপায় উপকরণের অধিকারী হওয়ার যাতে সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা মাফিক তার ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারে এবং সেগুলোকে নিজের ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী কাজে লাগিয়ে নিজের সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভাকে বিকশিত করে তুলতে পারে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর কোনো সম্ভাবনা নেই। সেখানে উপায় উপকরণ ব্যক্তির আয়ত্তে থাকে না, থাকে সমাজের নির্বাহী সংস্থার হাতে। আর সেই নির্বাহী সংস্থা সমাজস্বার্থের যে ধারণা পোষণ করে সে অনুযায়ীই সেসব উপায় উপকরণকে ব্যবহার এবং প্রয়োগ করে। ব্যক্তি যদি সেই উপায় উপকরণের দ্বারা উপকৃত হতে চায়, তবে তাকে সেই সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজ করতে হবে; শুধু তাই নয়, বরঞ্চ তাদের প্রস্তাবিত সামাজিক স্বার্থে কাজ করার উপযোগীরূপে গড়ে তোলার জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাদের হাতে সোপর্দ করতে হবে, যাতে করে তারা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে গড়ে তুলতে পারে। এ ব্যবস্থা কার্যত সমাজের সকল মানুষকে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হাতে এমনভাবে সমর্পণ করে দেয়, যেনো মানুষগুলো নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি সমাজের

মানুষগুলোকে নিজেদের নীল নকশার ছাঁচে এমনভাবে ঢেলে সাজায় যেমনভাবে চর্মকার চামড়া কেটে জুতো তৈরি করে এবং কর্মকার লোহা গলিয়ে লৌহসামগ্রী তৈরি করে থাকে।

ব্যক্তিত্বের বলি মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এ ব্যবস্থার অধীনে প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী সুবিচারের সাথেই বণ্টন করা হবে, তবু এর উপকারিতা এর ক্ষতির তুলনায় একেবারেই নগণ্য। মানুষ বিভিন্নমুখী শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে; সেগুলো পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়া এবং সম্মিলিত সমাজ জীবনে সে অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করার মধ্যেই সমাজ সভ্যতার সর্বাংগীন উন্নতি নির্ভরশীল। কিন্তু এসব সুযোগ সুবিধা লাভ করা এমন ব্যবস্থার অধীনে কখনো সম্ভব হতে পারে না, যেখানে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঁচামালের মত ঢেলে কাটছাঁট করে গড়ে তোলা হয়। কতিপয় ব্যক্তি, তা তারা যতোই যোগ্য এবং সদিচ্ছাসম্পন্ন হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই তাদের জ্ঞান ও দৃষ্টি এতোটা সর্বব্যাপী হতে পারে না যে, লক্ষ কোটি মানুষের জন্মগত যোগ্যতা প্রতিভা এবং তাদের স্বভাবগত ঝোঁকপ্রবণতার সঠিক পরিমাপ করা এবং সেগুলোকে বিকশিত করে তোলার যথার্থ পন্থা নির্ণয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। এটা একেবারেই অসম্ভব। এক্ষেত্রে তারা নিছক বিজ্ঞানের দিক থেকেও ভুল করতে পারে। আর সমাজের স্বার্থ এবং সামাজিক প্রয়োজন সম্পর্কে তাদের মানসিকতায় মানব-পরিকল্পনার যে পোকা কিলবিল করছে সেদিক থেকেও তারা তাদের অধীনস্থ গোটা ভূখণ্ডের মানুষকে তাদের সেই ছাঁচেই ঢেলে সাজাতে চাইবে। এতে সমাজের যাবতীয় বৈচিত্র সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে এক প্রাণহীন সাদৃশ্য রূপান্তরিত হবে। এর ফলে বন্ধ হয়ে যাবে সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি ও ক্রমবিকাশ আর আরম্ভ হবে এক ধরনের সম্পূর্ণ কৃত্রিম স্থবিরতা। এতে মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রতিভাসমূহ থেৎলে যাবে। অবশেষে দেখা দেবে এক মারাত্মক সামাজিক ও নৈতিক অধপতন। মানুষ তো আর বাগানের ঘাস কিংবা গুল্মলতা নয় যে, একজন মালি তাকে কাটছাঁট করে সাজিয়ে রাখবে, আর মালির পরিকল্পনা অনুযায়ীই সে বড় হবে কিংবা ছোট হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র ক্রমোন্নতি লাভ করে তার নিজস্ব স্বাভাবিক গতিতে। এ স্বাভাবিক গতিকে হরণ করে অপর কেউ তাকে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী চালাতে চাইলে তা ক্রমোন্নতি লাভ করতে পারে না। বরঞ্চ এমতাবস্থায় সে হয় বিদ্রোহ করবে আর না হয় শুষ্ক মৃতপ্রায় হয়ে থাকবে।

সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানব জীবনের মূল সমস্যা ধরে নিয়ে গোটা মানব জীবনকে ঘানির গরুর মতো এর চারপাশে ঘুরাতে চায়। মূলত এটাই সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভ্রান্তি। জীবনের কোনো একটি সমস্যার ক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্রের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও বাস্তবধর্মী নয়। বরঞ্চ সমাজতন্ত্র জীবনের সকল সমস্যাকে কেবল অর্থনীতির রংগীন চশমা দিয়েই দেখে থাকে। ধর্ম, নৈতিকতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান মোটকথা নিজের পরিসীমার মধ্যে প্রতিটি দিক ও

বিভাগকে সংকীর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখা হয়। এ একরোখা এ একদেশদর্শী গোঁড়ামী দৃষ্টিভংগির কারণেই সমাজতন্ত্রের আওতায় মানব জীবনের গোটা ভারসাম্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

ফ্যাসিবাদের সমাধান

সুতরাং পরিষ্কার হলো যে, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো সঠিক স্বাভাবিক সমাধান নয়। বরঞ্চ এ এক অস্বাভাবিক কৃত্রিম সমাধান। এর প্রতিকূলে আরেকটি সমাধান পেশ করেছে ফ্যাসিবাদ এবং জাতীয় সমাজতন্ত্র। এ মতবাদের দৃষ্টিতে জীবিকার উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তির মালিকানা বহাল থাকবে তবে সমাজস্বার্থের খাতিরে তা রাষ্ট্রের মযবুত নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বাস্তবে এ ব্যবস্থার ফলাফল সমাজতন্ত্রের ফলাফল থেকে মোটেই ভিন্ন কিছু নয়। এ মতবাদও সমাজতন্ত্রের মতোই ব্যক্তিকে সমাজস্বার্থের কাছে বিলীন করে দেয় আর তা ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের কোনো সুযোগই অবশিষ্ট রাখে না। তাছাড়া যে রাষ্ট্র ব্যক্তি মালিকানা ও অধিকারকে নিজ অধিকারে কুক্ষিগত করে রাখে সেতো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতোই নিপীড়ক, অত্যাচারী ও বলপ্রয়োগকারী হতে বাধ্য। একটি দেশের সকল ধনসম্পদ, ব্যবসা বাণিজ্য ও যাবতীয় উপায় উপকরণ নিজ কর্তৃত্বের অধীনে করায়ত্ত করে রাখা এবং নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করার জন্যে প্রয়োজন নিরংকুশ ক্ষমতা ও শক্তির। আর যে রাষ্ট্র এরূপ নিরংকুশ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হয়, তার হাতে দেশের সমগ্র অধিবাসীর সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়া এবং শাসকদের গোলামে পরিণত হওয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত ব্যাপার।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা মূলনীতি

يَـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡـفُسَكُمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمًا.وَمَنۡ يَّفۡعَلۡ ذٰ لِكَ عُدۡوَانًا وَّظُلۡمًا فَسَوۡفَ نُصۡلِيۡهِ نَارًا‌ ؕ وَكَانَ ذٰ لِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرًا

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে বা অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পার। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে বা একে অপরকে ধ্বংস করো না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থার প্রতি বড়

করুণাশীল। আর যারা জুলুমের সাথে এভাবে সীমা অতিক্রম করবে তাদেরকে অতি জলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করব। এটা আল্লাহর জন্য সহজ কাজ।
(আন-নিসাঃ ২৯-৩০)

এ আয়াতে পারস্পরিক লেনদেনকে ব্যবসা বলা হয়েছে এবং এতে পরস্পরের সম্মতিকে ব্যবসায়ের একটা শক্তি হিসেবে যোগ করা হয়েছে। এছাড়া পরস্পরের সম্মতির বাইরে যেগুলো অর্থাৎ যার মধ্যে কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি অথবা প্রতারণা কিংবা কোন চালবাজি আছে- যেখানে এক পক্ষের আসল কথা জানতে পারলে অপর পক্ষ লেন-দেন বা কেনা বেচায় রাজি হত না- এ ধরনের ধোঁকাবাজির মাধ্যমে যেসব লেন-দেন হয়, তার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে এক পক্ষ অপর পক্ষকে ধ্বংস করে। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা এভাবে অন্যায় করে একে অপরকে ধ্বংস করো না। এ অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা কথাটাকেই ভিন্ন ভাষায় আল্লাহ বলেছেন, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। এটা আসলে একটা নীতিগত নির্দেশ। এছাড়াও আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অর্থ উপার্জনের কতগুলো পন্থাকে স্পষ্ট ভাষায় হারাম করে দেয়া হয়েছে, যেগুলোকে আমরা উপার্জনের বাধা-নিষেধ বলতে পারি।

উপার্জনের বাধা-নিষেধ বা হারাম পন্থা

১। উৎকোচঃ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমাদের নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে-বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিও না।" - (আল-বাকারাঃ ১৮৮)

২। সম্পদ আত্মসাৎ করা:

وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ تَغُلَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

"নবী অন্যায়ভাবে কোন (ধন-সম্পদ) গোপন করবে এটা হতে পারে না যে অন্যায়ভাবে কোন সম্পদ গোপন করবে, কেয়ামতের দিন সে সেই গোপনকৃত মাল নিয়ে উঠবে। অতঃপর প্রত্যেককে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করা হবে। কারও প্রতি অবিচার করা হবে না।" (আল ইমরানঃ ১৬১)

৩। চুরি-ডাকাতি:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"চোর পুরুষ হোক বা নারী হোক, উরয়ের হাত কেটে দাও। এই তাদের কৃতকর্মের ফল এবং এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ শাস্তি। আল্লাহ মহাপরাক্রাশালী।"(মায়েদা-৩৮)

৪। এতিমের মালকে অন্যায়ভাবে তছরূপ করা।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

"ধারা এতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের পেটে আগুণ ভক্ষণ করে। তারা শীঘ্রই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।" (আন-নিসা-১০)

৫। চারিত্রিক অধঃপতন সৃষ্টি কারী উপায় উপকরণের যাবতীয়

ব্যবসায়:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"যারা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায় তাদের জন্য রয়েছে ইহকালে শাস্তি এবং পরকালেও শাস্তি। (তাদের সম্পর্কে) আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" (আন-নুর :110)
এর মধ্যে পড়বে অশ্লীল গান-বাজনা, সিনেমা, নভেল, নাটক ইত্যাদি ধরদের যাবতীয় সবকিছু। এদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।
৬। যেনা এবং বেশ্যাবৃত্তি করে অর্থ উপার্জন সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىۡ فَاجۡلِدُوۡا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا مِائَةَ جَلۡدَةٍۖ وَّلَا تَاۡخُذۡكُمۡ بِهِمَا رَاۡفَةٌ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِۚ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ
“ব্যভিচারীনি ও ব্যভিচারী উভয়েরই শাস্তি একশত করে দোররা(চাবুক) আল্লাহর এ বিধান কার্যকর করতে গিয়ে যেন দয়া-মায়া তোমাদেরকে অভিভূত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। এবং বিশ্বসীদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি চোখে দেখে।”(আন-নুর:২)

نِكَاحًا حَتّٰى يُغۡنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ الَّذِيۡنَ يَبۡتَغُوۡنَ الۡكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ فَكَاتِبُوۡهُمۡ اِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيۡهِمۡ خَيۡرًا ۖ وَّ اٰتُوۡهُمۡ مِّنۡ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىۡۤ اٰتٰٮكُمۡ ؕ وَ لَا تُكۡرِهُوۡا فَتَيٰتِكُمۡ عَلَى الۡبِغَآءِ اِنۡ اَرَدۡنَ تَحَصُّنًا لِّتَبۡتَغُوۡا عَرَضَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ؕ وَ مَنۡ يُّكۡرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنۡۢ بَعۡدِ اِكۡرَاهِهِنَّ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ
আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দাও। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদের কামনায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (আন -নুর:৩৩)

৭। মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার সরঞ্জাম , ভাগ্য গণনা ভরা ইত্যাদি হারাম এবং তৎসহ মদ পান করা, মদ উৎপাদন করা, মদের ব্যবসা করা, যথ পরিবহন করা ইত্যাদি এ সবই হারাম। বলা হয়েছে:
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَالۡمَيۡسِرُ وَالۡاَنۡصَابُ وَالۡاَزۡلَامُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ فَاجۡتَنِبُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ . اِنَّمَا يُرِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ اَنۡ يُّوۡقِعَ بَيۡنَكُمُ الۡعَدَاوَةَ وَالۡبَغۡضَآءَ فِى الۡخَمۡرِ وَالۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلۡ اَنۡـتُمۡ مُّنۡتَهُوۡنَ ٩١

"হে বিশ্বাসীগণ। মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য গণনা করা সব শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে বিদ্বেস সৃষ্টি করবে। আর তোমাদেরকে আল্লাহর স্বরণ থেকে ও নামায থেকে বাধা দেবে। তাহলে তোমরা কি এর থেকে বিরত থাকবে।(আল মায়িদা:৯০,৯১)

৮। সুদ খাওয়া ও সুদ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপই হারাম:

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ . يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করেই পাগল করে দেয়। এটা এজন্য যে, তারা বলে, কেনা-বেচা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ কেনা-বেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, অতঃপর (উপদেশ পেয়ে) সে বিরত হয়েছে তার অতীতের কার্যকলাপ তো পিছনেই পড়ে গেছে এবং তার ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা তা পুনরায় আরম্ভ করবে, তারা হবে আগুনের অধিবাসী, আর চিরদিন তারা সেখানেই বাস করবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর তিনি কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। অবশ্য যারা বিশ্বাস করে, যাবতীয় ভাল কাজ করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তাদের জন্যে তাদের প্রভুর নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং কোন দুঃখ-কষ্ট নেই। হে বিশ্বাসীগণ! তোম আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যই বিশ্বাসী হয়ে থাক।"

(আল-বাকারা: ২৭৫-২৭৮)

এর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে:

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ .

"অতঃপর তোমরা যদি তা (বকেয়া সুদ) না ছাড় তবে জেনে রেখ, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না।, অত্যাচারীতও হবে না।"

(আল-বাকারা: ২৭৯)

এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচনা হলো তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে-

(১) ঐ ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন হালাল, যে ব্যবসার মাধ্যমে কাউকে ঠকানো হয় না।
(২) উপরোক্ত পন্থায় (যা এতক্ষণ বলা হলো) অর্থ উপার্জন হারাম। এবার দেখা যাক অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ইসলাম কি বলে।

অর্থ সঞ্চয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা
অর্থ পুঞ্জিভুত বা কুক্ষিগত করে রাখার ঘোর বিরোধিতা করে ইসলাম বলে (কুরআনের ভাষায়)-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَٰهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُم۰ ۟

"যারা আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহে কৃপণতা করে তারা যেন একথা মনে না করে যে, তাদের এ কাজ (অর্থাৎ এ কৃপণতা) তাদের জন্যে মঙ্গলজনক,বরং এ কাজ তাদের জন্যে খুবই ক্ষতিকর।"
(আল-ইমরান: ১৮০)
অন্যত্র সূরা তওবার ৫ম রুকূতে আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله (لا) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۟

"এবং যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।"
(আত-তাওবা: ৩৪০)
আল-কুরআনের এ ভাষ্য পুঁজিবাদের মূল ভিত্তিতে আঘাত হানে।
কারণ-
পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা বলে- অধিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে রাখবে এবং তা অধিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের কাজে খাটাবে, এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি। কিন্তু-
ইসলাম বলে- প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ জমা করে রাখা যাবে না, তা খরচ করতে হবে। এবার শুনুন খরচের খাতগুলো:
ইসলামে খরচ বা ব্যয়ের খাত
ইসলাম অর্থ সঞ্চয় করে রাখার পরিবর্তে তা ব্যয় করার নির্দেশ দেয়।
ব্যয় সাধারণত: ৩ প্রকার। যথা-
১। নিজের মৌলিক প্রয়োজনে ব্যয়।
২। আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয়।
৩। অহেতুক কাজে ব্যয়, যাকে বলা হয় অপব্যয়।

১। নিজের মৌলিক প্রয়োজনে ব্যয়: ইসলাম নিজের মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর জন্যে ব্যয় করতে নিষেধ করে না তবে ব্যয়টা কিরূপ পন্থায় হবে তার মূলনীতি বলে দেয়। অর্থাৎ ইসলাম খাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করতে বলে ঠিকই কিন্তু মদ কিনে খাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করার

অনুমতি দেয় না। অনুমতি দেয় যা হালাল এবং যা যে পরিমাণ প্রয়োজন তা সেই পরিমাণ কিন্তু অহেতুক কাজে বা অপব্যয়ে ইসলাম অদৌ অনুমতি দেয় না।

২। আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় সম্পর্কে আল-কুরআন বলে-

ويَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ، قُلِ الْعَفْو

"অর্থাৎ, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তারা কি ব্যয় করবে? তাদের বল, যা তোমাদের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত (তাই ব্যয় কর)।"

(আল-বাকারা: ২১৯)

কিন্তু ব্যয় করবে কোন্ কোন্ খাতে, সে সম্পর্কে আল-কুরআন বলে-

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ وَالْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم -ْ

"আর সদ্ব্যবহার কর পিতামাতার সঙ্গে, নিকট আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে এবং এতিম, মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী বা আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, নিজের সঙ্গী-সাথী, বন্ধুবর্গ, মুসাফির ও তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে।"

(আন-নিসাঃ ৩৬)

অর্থাৎ, এদের কল্যাণের জন্যে এদের উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় কর আর এর মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। এছাড়াও আল্লাহর তরফ থেকে ফরমান জারী হলো যে-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ-ِ

অর্থাৎ, তাদের (ধনীদের) অর্থ-সম্পদে অধিকার বা পাওনা রয়েছে সাহায্য প্রার্থীদের ও বঞ্চিতদের।

অন্যত্র বলা হয়েছে, ঈমানদার লোক আল্লাহর মুহাব্বতে উদ্বুদ্ধ হয়েও কিছু ব্যয় করে। যথা-

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا
)الدهر(٨-٩ :

"তারা আল্লাহর মুহাব্বতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মিসকীন, এতিম ও কয়েদীদের আহার করায় এবং বলে আমরা তোমাদের খাওয়াচ্ছি তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় গ্রহণের উদ্দেশ্যে নয় বরং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।"

(দোহারঃ ৮-৯)

এ হচ্ছে আল্লাহ বিশ্বাসীদের লক্ষণ। এরা যা দান করে, তা কোন নিকৃষ্টতম জিনিস হয় না, তা হয় উত্তম জিনিস। কারণ আল্লাহ উত্তম জিনিসই দান করতে বলেছেন। যেমন বলা হয়েছে-

يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اخْرَجْنَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ مِن وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد ٌ
"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে উৎপাদন করে দেই তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর, আর তার ভিতর থেকে নিকৃষ্টতম জিনিস ব্যয় করার নিয়্যত কর না। কারণ তোমরা (নিকৃষ্ট জিনিস) গ্রহণ করতে চাও না, যদি তোমরা চোখ বন্ধ না করে থাক এবং জেনে রাখ, আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত।" (আল-বাকারাঃ ২৬৭)

এখানে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর মুহাব্বতে যা দান করা হয় তা প্রকারান্তরে আল্লাহকেই দেয়া হয়। আল্লাহ যেহেতু অভাবমুক্ত তাই তিনি নিকৃষ্টতম জিনিসের দান পেয়ে খুশি হবেন কেন? আল্লাহকে ভাল জিনিস থেকেই দিতে হবে, যদিও তা হাতে করে নেয় ছিন্নমূল গরীবরা।

কিন্তু কতিপয় ধনী আছে যারা আল্লাহ্র মুহাব্বতে নয়, বরং কিছু সুনাম অর্জনের জন্যে মাঝে-মধ্যে কিছু দান করে, তবে দানে যেন সুনামটা ঠিকমত আসতে পারে, সেজন্যে লোকদের সামনে দান করে এবং নিকৃষ্ট জিনিস থেকে দান করে। এটা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারীর লক্ষণ নয়। তাই আল্লাহ বলেন-

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا انفَقُوا مِنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنُون َ
"যারা আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তা লোকের নিকট বলে বেড়ায় না, (খোটা দিয়ে যাদের দান করে তাদের মনে) কষ্টও দেয় না তাদের পুরস্কার তাদের রবের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিত ও হবে না।"
(আল-বাকারা: ২৬২)

কাউকে দান করলে তা বলা মোটেই উচিৎ নয়। কারণ এরূপ বলায় যাকে দান করা হয় তাকে লজ্জা দেয়া হয়, আর সে তাতে মনে কষ্ট পায়। এর ফলে দানের সাওয়াব সব বরবাদ হয়ে যায়।

গরীব-মিসকীনদের সাহায্য দুই প্রকার হতে পারে, যথা- (১) আল্লাহর ওয়াস্তে দান। (২) কর্জে হাসানা। অর্থাৎ যত টাকা ধার দিবে, ঠিক তত টাকাই তার নিকট থেকে ফেরত নেবে। এক চুল পরিমাণও বেশী নেবে না। এরূপ ধার দেয়াকেই কর্জে হাসানা বলে।।

কিন্তু কাউকে কর্জে হাসানা দেয়ার পরেও যদি এমন অবস্থা এসে যায় যে, সে আর কর্জ পরিশোধ করতে পারছে না, সেখানে জোর করে বা চাপ সৃষ্টি করে তার নিকট থেকে টাকা আদায় করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

এসব ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে যে, আমি যদি অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতাম এবং আমি যদি এর মত অভাবী হয়ে পড়তাম তাহলে আমার সঙ্গে ঋণদাতা কিরূপ ব্যবহার করলে

আমি খুশী হতাম ও উপকৃত হতাম। যেমন ব্যবহারে আমি খুশী হতাম ঠিক তেমন ব্যবহার তার সঙ্গে করতে হবে, যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করেছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সব ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে তার কোন সীমা ঠিক করে দেয়া হয়নি। দেয়া হয়নি এজন্যে যে, ঈমানদার ব্যক্তিগণ যেন আল্লাহ্র মুহাব্বতে এবং তাঁর রাজি-খুশী অর্জনের জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে যা কামাই করে তার থেকেই যেন কিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে সে তার ঈমানের পরিচয় দিতে পারে। এর পরে বলা হয়েছে যারা ধনী তাদের সম্পর্কে। তাদের যেহেতু বেশী আছে, তাই তাদের নিকট থেকেই যেন কিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে সে তার ঈমানের পরিচয় দিতে পারে। এর পরে বলা হয়েছে যারা ধনী তাদের যেহেতু বেশী আছে তাই তাদের নিকট থেকে আল্লাহর পাওনাটা কড়ায় গন্ডায় হিসাব করে আদায় করতে বলা হয়েছে। (আল্লাহর পাওনাটা হচ্ছে আল্লাহর গরীব বান্দাদের জন্যে) আর তা হচ্ছে-

যাকাত

বলা হয়েছে-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"তাদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ কর যা ঐ ধন-সম্পদকে পাক-পবিত্র ও হালাল করে দেবে।"আল্লাহ চান গরীব ও অসহায়দের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্যে যাকাত চালু করতে এবং সুদ বন্ধ করতে। এজন্যে আল্লাহ বলেন-

يَمْحَقُ الله الربو ويُربي الصَّدَقَت ِ

আল্লাহ সুদকে নির্মূল করেন এবং দান-ছদকাকে প্রতিপালন করেন অর্থাৎ তার ক্রমবৃদ্ধি করেন।-

(আল-বাকারা: ২৭৬)

এসম্পর্কে আল্লাহ আরও বলেন-

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُضْعَفُونَ

তোমরা এই যে সুদ দাও মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির আশায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে ধন-সম্পদ আল্লাহর নিকট বাড়ে না। তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে যে ধন-সম্পদ দান-ছদকা করে থাক বা যাকাত দিয়ে থাক প্রকৃতপক্ষে তাতেই আল্লাহ ক্রমবৃদ্ধি দিয়ে থাকেন।

(রুম: ৩৯)

আল্লাহ সুদকে নির্মূল করে তদস্থলে যাকাতকে চালু করার কথা বলেছেন। চিন্তা করল প্রত্যেকেরই সহজ জ্ঞানে ধরা পড়বে যে, যাকাত এবং সুদ হচ্ছে পরস্পর বিরোধী দু'টো পথ

বা ব্যবস্থা যা একই সঙ্গে একই সমাজে চালু থাকতে পারে না, যেমন কোন ভূ-খন্ডে একই সঙ্গে দিন এবং রাত থাকতে পারে না। সূর্য উঠলে (দিনের আগমনে) রাত যেমন আপসে চলে যায় তেমন যাকাত কোন সমাজে চালু হলে সে সমাজ থেকে আপসে সুদ উঠে যাবে। সূর্য উঠলে যেমন রাতের অন্ধকারকে তাড়াতে হয় না, এমনি আঁধার দূর হয়, ঠিক তেমনি যাকাত চালু হলে সুদকে তাড়ানো লাগবে না এমনি দূর হয়ে যাবে।

কেমনভাবে তা হবে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন মনে করুন, বাংলাদেশের সবচাইতে বড় ধনী যিনি ১ শত কোটি টাকার মালিক তার নিকট বাংলাদেশের একদল গরীব এসে হাজির হলো। তারা বলছে আমাদের প্রত্যেককে ৫০০ করে টাকা সুদে ধার দিন। আমরা ছোট-খাট কোন ব্যবসা করে বা হকারি করে কোনমতে একটু বাঁচার ব্যবস্থা করি।

অতঃপর সে ধনী ব্যক্তি যদি বলেন যে, যেহেতু আল্লাহ বলেছেন-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

অর্থাৎ, তাদের (ধনীদের) অর্থের মধ্যে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা (যাকে আল্লাহ বলেছেন 'হক')। সেই পাওনাটা প্রথমে আমি তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দেই, তারপর সুদে ধার দেব।

অতঃপর যদি তার অর্থ থেকে আড়াই কোটি টাকা যাকাত বাংলাদেশের গরীব যারা তার নিকট সুদে টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দেয়, আর তারা যদি এক-একজনে ভাগে এক হাজার করে টাকা পাওনা হিসাবেই পেয়ে যায় তাহলে কি তাদের কেউ আর সুদে টাকা ধার নিবে? তা অবশ্যই নিবে না।

এ কারণেই বলছি, যাকাত তেমনভাবেই সুদকে বিতাড়িত করে যেমন দিন এসে রাতকে বিতাড়িত করে।

এছাড়াও চিন্তা করলে দেখা যায়, সুদ হচ্ছে প্রকৃতি বিরোধী আর যাকাত হচ্ছে প্রকৃতিগত ব্যবস্থা। যাকাতের অর্থ উপর থেকে নিচে আসে আর সুদের অর্থ নিচ থেকে উপরে উঠে। এজন্যেই বলেছি, সুদ প্রকৃতি বিরোধী। কারণ প্রত্যেক জিনিসই উপর থেকে নিচের দিকে আসে। আর এটাই স্বাভাবিক কিন্তু কোনকিছুই নিচু থেকে উপরে ওঠা স্বাভাবিক নয়। বরং তা হচ্ছে একটা দুর্লক্ষণ। যেমন পানি যখন আকাশ থেকে নীচে নাযিল হয়, তখন তা হয় প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণকর। এমনকি বন্য পশু, জীব-জানোয়ার, গাছপালা ইত্যাদি সবকিছুর জন্যই একটা রহমত স্বরূপ। কিন্তু যদি প্লাবন হয়ে নিচের পানি উপরের দিকে ওঠে, তাহলে তা হয় সবকিছুর জন্যেই বিপদের কারণ অর্থাৎ গাছপালা, জীব-জানোয়ার তথা। হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু এবং মানবকুল- প্রত্যেকের জন্যই একটা মহাবিপদের কারণ,এভাবে দেখা যায়, প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গকারী কোনকিছুই আল্লাহর সৃষ্টির কোনকিছুর জন্যই কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই সুদও প্রকৃতির নিয়ম। ভঙ্গকারী ব্যবস্থা। তা কোনদিনই মানব সমাজে কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন-

"সুদের সত্তরটি অংশ রহিয়াছে, তার মধ্য থেকে সবচাইতে ছোট গুনাহ হইল নিজ জননীকে বিবাহ করা। (বায়হাকী ও ইবেন মাজাহ)
মিরাসি আইন

নিজের প্রয়োজনে ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার পরও যদি কেউ অর্থ সম্পদ রেখে মারা যায়, তবে সম্পদ কোথাও কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে এ সুযোগ ইসলামে দেয়া হয়নি। ইসলামের আইন মুতাবিক সে সম্পত্তি ভাগ ভাগ হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট চলে যাবে বিকেন্দ্রিক হয়ে। আর যদি এমন হয় যে, কেউ মরে যাওয়ার পর কোন ওয়ারিস রইল না তখন কোন পোষ্য পুত্র বানিয়ে কাউকে অর্থ-সম্পদ দান করে যাওয়ার পরিবর্তে ইসলামী আইনে বলে ঐ সম্পদ বায়তুল মালে জমা করে দিতে। যেন দেশের প্রত্যেকেই তার অংশীদার হতে পারে। একমাত্র ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যেই আছে মিরাসী আইনের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ অন্যের মালিকানায় পৌছে যাওয়া যা আর কোন অর্থব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায় না।

গণিমত বা বিজিত সম্পদ বন্টন

এ ব্যাপারেও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্বচ্ছ। ইসলাম বলে-

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيل: ِ

)الانفال(٤١ -

"জেনে রেখ, গণিমত হিসাবে যে মাল তোমাদের হাতে আসে তার এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহর, তার রাসূলের, রাসূলের নিকটাত্মীয়ের এতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।" (আনফালঃ ৪১)
এই এক পঞ্চমাংশে আরো যে তিন শ্রেণীর জন্য অংশ রাখা হয়েছে, তারা হচ্ছে এতিম, মিসকীন ও গরীব সর্বহারা, বিধবা, বিকলাঙ্গ, অক্ষম, রুগ্ন, অভাবী লোক এবং পথিক যারা মুসাফিরী হালতে অর্থ শূন্য হয়ে পড়ে তাদের জন্যও এই পঞ্চমাংশের মধ্যে হিস্যা রয়েছে।
এছাড়া যুদ্ধের ফলে কোন ধন-সম্পদ যদি ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে আসে তবে সেগুলো সম্পূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে রাখার বিধান রয়েছে আল-কুরআনে। পড়ে দেখুন সূরায়ে হাশরের ১ম রুকূ।
ইসলামে মিতব্যয়ী হওয়ার নির্দেশ

আল্লাহ বলেন

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"নিজের হাত একেবারে এঁটে ও বেঁধে দিও না এবং একেবারে খুলেও দিও না, যার ফলে পরবতীকালে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়।"- (বনী ইসরাঈল: ৩৯)

আল্লাহ সৎলোকদের কথা বলেছেন-

وَالَّذِينَ إِذَا انْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قواما

"এবং তারা যখন ব্যয় করে তখন অমিতব্যয় করে না, আবার কার্পণ্যও করে না বরং তারা ভারসাম্যমূলক পন্থা অবলম্বন করে।" (আল-ফুরকানঃ ৬৭)

উদ্দেশ্য, যেন অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে এমন একটা ভারসাম্য সমাজে কায়েম হয়, যাতে সমাজের সর্বস্তরের লোক উপকৃত হতে পারে।চিন্তা করুন, এ ধরনের একটা ভারসাম্যমূলক অর্থ ব্যবস্থা যদি সমাজে কায়েম হয়ে যায় তবে সে সমাজে সুদ স্থান পায় কি? সুদে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনটাই যখন আর থাকে না তখন সুদ সমাজে প্রবেশ করবে কোন্ পথধরে?

মানব দেহে যেমন শিং এবং লেজ ফিট হয় না, ঠিক তেমনই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সুদ ও অপব্যয় ফিট হয় না। এবার দেখা যাক ইসলাম অপব্যয় সম্পর্কে কি বলে।

অপব্যয় বা অহেতুক ব্যয়

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত নিজের পার্থিব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় ও আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় বা আল্লাহর বিধান মুতাবিক ব্যয় সম্পর্কে আলোচনানকরেছি। এবার আসুন আমরা অপব্যয় সম্পর্কে আল্লাহর ভাষাগুলো জানার ও বুঝার চেষ্টা করি। আল্লাহ বলেন-

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطِين
وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُورا

"তোমরা অহেতুক খরচ করো না। যারা অহেতুক খরচ করে বা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তো আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহকারী।" (বনী ইসরাঈল: ২৭)

এখানে এই সংক্ষিপ্ত কথাটাকে বুঝবার জন্য আমরা তিনভাগে ভাগ করে নিতে পারি। যথা-

১। নিষেধ করা হলো 'অপব্যয় করো না'।

২। বলা হলো 'যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই'।

৩। সর্বশেষ বলা হলো 'শয়তান তো আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহকারী।

'এর থেকে যে মূল শিক্ষাটা আসছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে এই যে, আল্লাহ চান সমাজে পূর্ণাঙ্গ শান্তি বিরাজ করুক। আর শয়তান চায় তার উল্টা। অর্থাৎ সমাজে নেমে আসুক চরম অশান্তি। আর এ অশান্তি যেমন আসে অর্থনৈতিক অব্যবস্থার কারণে বা অভাবের তাড়নায় তেমন আর কোন পথে আসে না। তাই শয়তান চায় জনসাধারণকে অর্থনৈতিক দূরবস্থার মাধ্যমে চরম অশান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে। আর এটা আসে অপব্যয়ের মাধ্যমে।
তাই শয়তান খুব জোরেশোরে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে অপব্যয়ের জন্যে। আর এটা যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছার সম্পূর্ণ রিরুদ্ধে, তাই বলা হলো শয়তান অপব্যয়ের দিকে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে প্রকারান্তরে আল্লাহ্ সাথে বিদ্রোহ করে। আর সাথে সাথে এ কথাও বলা হলো যে, যারাই অপব্যয় করে তারাই শয়তানের ভাই অর্থাৎ যারা অপব্যয় করে তারা সবাই আল্লাহ্র সাথে বিদ্রোহ করে।

অপব্যয় বন্ধ করলে যে অর্থ বেঁচে যায়

আমাদের এ সমাজে কত খাতে যে অপব্যয় হয় তা গুনে শুমার করা একটুখানি কথা নয়। আমি চিন্তা করে দেখার জন্য কয়েকটা বিষয়ের উপর কিছুটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি যার থেকে একটা কাছাকাছি অনুমান করা যাবে। এর জন্য প্রথমেই জেনে নিতে হবে অপব্যয় কাকে বলে।

অপব্যয়ের অর্থ

মানুষ সাধারণতঃ ৩ ধরণের কাজে ব্যয় করে যা পূর্বেই বলা হয়েছে। যার দুই ধরনের ব্যয় বৈধ আর এক ধরনের ব্যয় অবৈধ। যথা-
১। নিজের মৌলিক প্রয়োজনে ব্যয়ঃ
এটা দু প্রকারে, যথা-
(ক) এমন কাজে ব্যয় করে যাতে ইহকালেও লাভ আছে পরকালেরও লাভ আছে। যেমন জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষ যে ব্যয় করে তাতে দুনিয়ার জীবনেও উন্নতমানের জীবন যাপন করতে পারবে পরকালের জীবনের জন্যও সওয়াব অর্জন করবে। এ ধরনের বহু খাত রয়েছে যেখানে ব্যয় করলে ইহকাল-পরকাল দুই কালের জন্যই ফলদায়ক হবে। এ ব্যয় বৈধ।
(খ) এমন কাজে ব্যয় করা যাতে পরকালের জন্য লাভের কিছু নেই। কিন্তু ইহকালের জীবনে লাভ আছে। যেমন গাড়ি কেনা, উন্নতমানের বাড়ি তৈরি করা ইত্যাদি। এ ব্যয়ও বৈধ।

২। আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয়:

অর্থাৎ, এমন খাতে ব্যয় করা যাতে শুধু পরকালের জীবনে ফায়দা পাওয়া যাবে। এ জীবনে তার থেকে কোন ফায়দা কেউ আশা করে না যেমন দান-ছাদকা করে অর্থ ব্যয় করা। এ ব্যয়ও বৈধ।

৩। অপব্যয়:

অর্থাৎ এমন কাজে ব্যয় করা যাতে ইহকালের জীবন ধারনের জন্যও কোন কাজে লাগে না এবং পরকালের জীবনের জন্যও কোন কাজে লাগবে না। এ সবই হচ্ছে অপব্যয়। যেমন-

(ক) হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে খেলনা জাতীয় জিনিসপত্র দিয়ে ঘর সাজানো।

(খ) বাড়ি যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে বড় বাড়ি করে অনর্থক কিছুটা যমীনকে আটক করে রাখা এবং ঐ বাড়ির বাড়তি অংশ তৈরির জন্য অর্থ ব্যয় করা।

(গ) বিয়ের মজলিসে সাধারণতঃ এ সমাজে যা খরচ হয়ে থাকে, তার প্রায় অর্ধেকই হয় অপব্যয়। যেমন ডেকোরেটর দিয়ে গেট সাজান ইলেক্ট্রিসিটির ব্যয় ইত্যাদি ধরনের ব্যয়ের সবই অপব্যয়।

(ঘ) কর্তাব্যক্তিদের বসবাসের এলাকায় বড় বড় গাছগুলোর গুড়ির প্রায় ৪/৫ ফুট চুন বা ডিসটেম্পার দিয়ে সাদা করে দেয়া। এগুলোও অপব্যয়।

(ঙ) এমন বহু দোকান আছে সেসব দোকান থেকে যা কিনবে তাতেই অপব্যয় হবে। যেমন- প্লাষ্টিকের কাঁচের ও কাঠের এমন হাজারও প্রকার খেলনা রয়েছে, যার কোন উপযোগিতা নেই। এ সবই অপব্যয়।

এছাড়া আরও এমন বহু অপব্যয় রয়েছে যার খবর শুধু ধনী ব্যক্তিরাই জানতে পারে, যা গরিবদের যানার কোন সুযোগ নেই। যেমন ১০ জন মেহমানকে দাওয়াত করে ২০ জনের খাবার সামনে হাজির করা এবং যা খেতে পারে না তা সোজাসুজি ফেলে দেয়া। এভাবে পৃথিবীতে যে কত কোটি কোটি টাকার খাদ্য নষ্ট হচ্ছে কয়জন তার খবর রাখে।

অপব্যয় রোধ করার জন্য ইসলামের এত কড়া নির্দেশ যে, জামা তৈরি করতে গিয়েও যেন প্রয়োজনের বেশি কাপড় কেউ খরচ না করে সেজন্যও তাগিদ রয়েছে। হ্যা তবে অল্প দাবী কাপড়ের পরিবর্তে যদি কেউ ভাল মজবুত কাপড়- যা অনেকদিন টিকবে এমন কাপড়- কিছু বেশী দাম দিয়ে ক্রয় করে, তবে তাতে অপব্যয় হবে না কিন্তু জামা যেখানে ২/৩ টায় সুধী ব্যক্তিগণ যদি হিসেব করে দেখেন তবে অবশ্যই দেখবেন, একটা দেশ যদি ইসলামী বিধান মুতাবিক অপব্যয় বন্ধ করতে পারে- যেন বন্ধ করা হয়েছিল রাসূল (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে- আর যদি শুধু যা অপব্যয় হয় সেই টাকাগুলোই গরীব ও অসহায়দের পুর্নবাসনের জন্য খরচ করা হয় তাহলে কোন দেশেই এমন কোন ব্যক্তি থাকতে পারে না যাদের ভিক্ষার কোন প্রয়োজন হতে পারে।

বলা বাহুল্য, এ অপব্যয় বন্ধ করা যারা সহ্য করতে পারে না তারাই ইসলামী সমাজব্যবস্থার দুশমন এবং তারাই জোরেশোরে প্রচার করেন যে, মান্ধাতার আমলের ইসলাম এখন আর

চলতে পারে না। আল্লাহ তাদেরকেই বলেছেন إِخْوَانُ الشَّيْطِي বা শয়তানের ভাই। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন আমিন।

অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের ইসলামী সমাধান

'ইতিহাসের শিক্ষা' আলোচনা প্রসংগে আমরা যে অর্থনৈতিক সমস্যার উল্লেখ করেছি, ইসলামের উপস্থাপিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে সেই সবের সমাধান কিরূপে হতে পারে, বর্তমান পর্যায়ে আমরা তারই আলোচনা পেশ করবো। এ প্রসংগে সর্বপ্রথম কয়েকটি মৌলিক তত্ত্বকথা স্মরণ রাখা আবশ্যক বলে মনে করি।
কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব

ইসলামী সমাজ সংস্থা সঠিকরূপে বুঝার জন্য সর্বপ্রথম একথা জেনে নেয়া আবশ্যক যে, ইসলামী দৃষ্টিভংগিতে আসল গুরুত্ব হচ্ছে ব্যক্তির সমাজ, জাতির বা সমষ্টির নয়। বস্তুত ব্যক্তি-জাতি বা সমষ্টির জন্য নয়, সমষ্টি বা জাতি ব্যক্তির জন্য। আল্লাহর নিকট একটি সমাজ, জাতি বা সমষ্টি সামগ্রিকভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে না, এক এক ব্যক্তি, তার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যমূলক মর্যাদা সহকারে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্ত্বা হিসেবেই দায়ী হবে-জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে। আর এ ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও জবাবদিহির ভিত্তির উপরই মানুষের সমগ্র নৈতিক মূল্য ও মর্যাদা স্থাপিত। সামাজিক জীবনের মূল লক্ষ কেবল সামগ্রিক কল্যাণ নয়, প্রকৃতপক্ষে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির কল্যাণই হচ্ছে কাম্য। একটি সমাজ ব্যবস্থার ভাল ও মন্দ-কল্যাণময় ও বিপর্যয়গ্রস্ত হওয়ার প্রকৃত মানদণ্ড হচ্ছে এ প্রশ্নের জবাব যে, ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্ত্বার উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ এবং তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা কর্মক্ষমতার অভিব্যক্তি সাধনে তা কতদূর সাহায্যকারী ও অনুকূল কিংবা প্রতিরোধক। এ কারণে ইসলাম সমাজ-সংগঠনের এমন কোনো ধরন এবং সামগ্রিক কল্যাণের নামে এমন কোনো ব্যবস্থাপনা কিছুতেই সমীচীন বলে গ্রহণ করতে পারে না, যাতে ব্যক্তিগণ তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলতে ও বিরাট জনতা মুষ্টিমেয় শাসকের হাতে যন্ত্রের অংশবিশেষের মত বন্দী হয়ে পড়তে বাধ্য হতে পারে।
বস্তুর চিন্তা ও কর্মের নিরংকুশ আযাদী লাভ ছাড়া, ব্যক্তি-মানুষের স্বাতন্ত্র্য সঠিকভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না এবং তার ব্যক্তিত্বের সঠিক অভিব্যক্তিও সম্ভবপর নয়। এ উদ্দেশ্যে কেবল মত প্রকাশ, লেখা ও বক্তৃতা, চেষ্টা-সাধনা এবং সভা-সম্মেলন-সংগঠন করার আযাদীই যথেষ্ট নয়, অর্থ রোযগারের আযাদীও অনুরূপ মাত্রায়ই জরুরী। এটা এমন এক স্বাভাবিক ও স্বতসিদ্ধ সত্য, যা প্রমাণ করার জন্য কোনো লম্বা-চওড়া আলোচনার প্রয়োজন থাকতে পারে না। এর প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা অনুভব ও অনুধাবন করার জন্য সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট। একজন পথিক মানুষও একথা ভালো করে জানে যে, যে ব্যক্তির জীবন-জীবিকারই আযাদী

নেই, তার কোনো প্রকার আযাদীই, থাকতে পারে না। না থাকতে পারে তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা, না কথা বলার, না লেখনী চালনার, আর না চেষ্টা ও সাধনার কোনো আযাদী। অতএব, যে সমাজে আল্লাহর এক বান্দার পক্ষে আত্মবিক্রয় না করেই নিজের চেষ্টা-সাধনার ফলে দুই বেলার খাদ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়, মানবতার জন্য কল্যাণকর সমাজ একমাত্র তাই হতে পারে। শিল্পবিপ্লব যুগে এর সুযোগ খুবই সামান্য, ভারী শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং বৃহদায়তন কৃষি ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত হস্তশিল্পী, কারিগর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষকদের জীবন এতদূর সংকীর্ণ করে দিয়েছে যে, এরা বড়দের সাথে প্রতিযোগিতায় নিজেদের স্বাধীন ব্যবসায় ও পেশাকে সাফল্যের সাথে চালিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা নীতি স্বীকৃত, তাতে সচ্ছল কর্মক্ষম ধরনের লোকগণ নিজের স্বাধীন শিল্প, ব্যবসায় কিংবা কৃষি প্রতিষ্ঠান কায়েম করার সুযোগ পেতে পারে। অপরদিকে নিঃসম্বল শ্রমজীবীদের জন্যও তাতে অন্তত এতটুকু অবকাশ অবশ্যই থেকে যায় যে, এক ব্যক্তি বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা মজুরী করতে অনিচ্ছুক হলে অপর যে কোনো দুয়ারে সে উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু যেখানে সমগ্র কিংবা বেশীর ভাগ উৎপাদন উপায়কে জাতীয় মালিকানাভুক্ত করা হয়, কিংবা যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও নাৎসী বা ফ্যাসীবাদী পদ্ধতিতে সমগ্র অর্থনৈতিক কাজকর্মকে রাষ্ট্রের নিরংকুশ দখলের অন্তরভুক্ত করে সর্বগ্রাসী ও সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়, সেইরূপ সমাজে জনগণের ব্যক্তিগত আর্থিক স্বাধীনতা কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। আর তার অবসান হলে সাথে সাথেই মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আযাদীও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যেতে বাধ্য। কাজেই যে জীবনব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভালবাসে এবং মানবীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনকে উদ্দেশ্যমূলক গুরুত্ব দেয়, তার পক্ষে জমি, কারখানা, ব্যবসায়সমূহের জাতীয়করণ কিংবা রাষ্ট্রের নিরংকুশ প্রভুত্বের অধীন এক কেন্দ্রীয় পরিচালনা অনুযায়ী সমগ্র অর্থনীতির যন্ত্র পরিচালনের উদ্দেশ্য মতবাদ রচিত সামাজিক কল্যাণকামী সকল প্রকার নীতি আদর্শ ও মতবাদকে পদাঘাত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকতে পারে না।

এ ব্যাপারে ইসলাম ঠিক সেই ভূমিকাই অবলম্বন করেছে। কমিউনিজমের সাথে ইসলামের বিরোধের কারণ কেবল এটাই নয়। কমিউনিষ্টগণ উৎপাদন-উপায়সমূহকে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে টেনে নিয়ে আতীয় মালিকানার পর্যায়ে ফেলার জন্য বলপ্রয়োগ ও অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়ন করে থাকে। কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য এ যুলুম-পীড়নমূলক লুণ্ঠনের পন্থা যদি অবলম্বন না-ও করা হয় এবং তার পরিবর্তে যদি জমি-জায়গা ও শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইনের সাহায্যে ক্রমশ জাতীয় মালিকানায় পরিণত করার ক্রমবিকাশমান সমাজতন্ত্রের নীতি অবলম্বন করা হয়, তবুও ইসলামের প্রকৃতি তাকে কিছুতেই কবুল করতে পারে না। কেননা, এ ধরনের সমাজনীতি প্রকৃতিগতভাবেই মানবতার পক্ষে মারাত্মক ও ধ্বংসকারী। নাৎসী ও ফ্যাসী পদ্ধতির নিয়মবন্ধতা (Regimentations) ও পরিকল্পনা পদ্ধতিও ইসলামের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা এসব নীতি আদর্শের সামগ্রিক স্বার্থ যাই হোক

না কেন, মানবীয় ব্যক্তিত্বের ক্রমবর্ধন ও পূর্ণত্ব লাভের এটা সুস্পষ্টরূপে পরিপন্থী এর আরো একটি দিক বিবেচ্য। ইসলাম মানুষের মধ্যে যেরূপ মানসিকতা ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করতে চায়, তার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার ব্যাপারে স্বীয় দায়িত্বের তীব্র অনুভূতি। এ দুটি গুণ যে ব্যক্তি বা সমাজের লোকদের মধ্যে বর্তমান হবে, তাদের উপর যদি সামগ্রিক ও জাতীয় কাজকর্ম করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে তারা নিজেরাই এমন এক ব্যবস্থা কায়েম করার ও তা পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে না, যাতে নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব বুঝার সাথে সাথে লক্ষ কোটি মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্বভারও নিজেদের স্কন্ধে টেনে নিবে। নবী করীম স. মদীনায় এক দুর্ভিক্ষের সময় একথাই বলেছিলেন। তাঁর সামনে এ নিবেদন করা হয়েছিল যে, দ্রব্যমূল্য তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আপনি নিজেই দ্রব্যাদির মূল্য নির্দিষ্ট করে দিন। নবী করীম স. এটা করতে সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর অসমর্থ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন।

اني أريد أن القى الله وليس لأحد عندي مظلمة يَطْلُبْنِي بِهَا

"আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করতে চাই যে, আমার বিরুদ্ধে কারো উপর কোনো যুলুম করার একবিন্দু অভিযোগও থাকবে না ও আমার নিকট তা দাবী করা হবে না।
"

পরন্তু ইসলাম প্রত্যেকটি ব্যাপারে মানুষকে তার স্বাভাবিক অবস্থার নিকটবর্তী করে রাখতে চায়। জীবনের কোনোদিকেই কৃত্রিমতাকে ইসলাম মাত্রই পসন্দ করে না। বস্তুত মানবীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা এটাই হতে পারে যে, এ যমীনের বুকে আল্লাহ জীবন-জীবিকার যত উপায়-উপাদান সৃষ্টি করেছেন, ব্যক্তিগণ তা নিজেদের আয়ত্তাধীন করে নিবে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিংবা সমষ্টিগতভাবে তার ভোগ-ব্যবহার করবে, তা থেকে উপকার লাভ করবে। দ্রব্যাদি এবং শ্রম ও কাজের পারস্পরিক লেনদেন স্বাধীনভাবে করতে থাকবে। স্মরণাতীত কাল থেকে মানবীয় রুটি-রুযীর কারখানা ঠিক এ পদ্ধতিতেই চলে এসেছে। একজন মানুষ সমাজের মধ্যে বসবাস করতে থাকা অবস্থায় স্বীয় রুটি-রুযীর ব্যাপারে স্বাধীন এবং জীবন ক্ষেত্রে স্থিতিসম্পন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কেবল এরূপ স্বাভাবিক ব্যবস্থাই হতে পারে। অনভিজ্ঞ ও অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকদের সাথে রচিত অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ মতাদর্শ ইসলামই কোনো না কোনো কৃত্রিম সমাজ ও অর্থব্যবস্থা পেশ করে এবং এ ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ এক স্বতন্ত্র আত্মাসম্পন্ন, চেতনাময় ব্যক্তিত্ব ও উদ্দেশ্যমূলক গুরুত্বসম্পন্ন সত্তা হিসেবে জীবনযাপনের সুযোগ পায় না। মানুষ সেখানে এক সমাজ যন্ত্রের নিষ্প্রাণ অংশ হয়ে থাকতেনবাধ্য হয়।

কৃত্রিম উপায়সমূহের মত বিপ্লবাত্মক কর্মনীতিও ইসলাম সমর্থন করে না। জাহেলিয়াতের যুগে আরববাসীগণ যেসব পন্থায় রুযী-রোযগার করতো তার অনেকগুলোকেই ইসলাম উত্তরকালে

হারাম-তীব্রভাবে ঘৃণার্হ বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু পূর্ব থেকে লোকদের নিকট' যেসব বিত্ত-সম্পত্তি চলে এসেছিল সেই সম্পর্কে ইসলাম কোনো প্রশ্নই উত্থাপন করেনি-পূর্বেই হারাম উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করারও কোনো ঘোষণা প্রচার করেননি। এমন কি, সুদখোর, বারবণিতা ও চোর-ডাকাতের পর্যন্ত অতীতের কীর্তি, কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন মনে করেননি। যার নিকট যাই ছিল, ইসলামের দেওয়ানী আইন তার উপর তার মালিকানা অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। অবশ্য ভবিষ্যতের জন্য সকল প্রকার হারাম উপার্জন উপায় বন্ধ করে দিয়েছে এবং পূর্ববর্তী মালিকানা-সমূহকে ইসলামের মিরাসী আইন ক্রমশ বণ্টিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে।

রোগ নিরূপণ

পূর্বোল্লিখিত তত্ত্বসমূহ হৃদয়ংগম করার পরই গ্রন্থের প্রাথমিক আলোচনা-সমূহ একবার স্মরণ করে নিতে হবে। এ গ্রন্থের শুরুতেই আমরা বলেছি যে, শিল্পবিপ্লবের যুগে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা যদিও স্মরণাতীত কাল থেকে চলে এসে আর্থিক রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু তার কঠিন বিপর্যয় উদ্ভূত হওয়ার চারটি মৌলিক কারণ শুরু থেকেই বর্তমান থেকে যায় এবং এটাই শেষ পর্যন্ত কঠিন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণ চারটি এই:

প্রথমঃ এ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণ সেই চিরন্তনী নীতিসমূহের ব্যাপারে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি প্রদর্শন করে, অথচ অন্য শিল্প যুগের পক্ষে তা কিছুমাত্র সমীচিন ছিল না।

দ্বিতীয়: তারা সেই চিরন্তনী স্বাভাবিক রীতিনীতির সাথে আরো কয়েকটি ভ্রান্তনীতির সংযোজন করে।

তৃতীয়ঃ স্বভাবসম্মত অর্থব্যবস্থার কতগুলো মূলনীতিকে তারা উপেক্ষা করে, অথচ তা পুঁজিবাদী সমাজের সপ্ত মূলনীতির মতোই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অতপর এসব অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিতরূপে একথা বলেছি যে, একদিকে সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ এবং অপরদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভাবিত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও রোগের চিকিৎসার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তা সবই ব্যর্থ হয়েছে কেবলমাত্র এজন্য যে, তাদের কেউই রোগের প্রকৃত ও মূলগত কারণ নির্ণয় করতে সমর্থ হয়নি। একদল প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত রীতিনীতিকেই রোগের আসল কারণ মনে করতে লাগলো এবং সেইগুলো বিদূরণের সাথে সাথে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকেও তারা খতম করে দিল।

অপর দল কেবল অভিযোগ খণ্ডনেই সমস্ত লক্ষ আরোপ করে এবং দোষ ও বিপর্যয়ের মূল কারণসমূহকে যথারীতি বর্তমান থাকতে দেয়া হয়। এর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত

স্বাধীনতা তো থেকে গেল, কিন্তু তা কার্যত সামগ্রিক স্বার্থের দৃষ্টিতে ঠিক ততখানি ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ালো, যতখানি পুঁজিবাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তরে তা মারাত্মক ছিল।

এ রোগ নিরূপণ পদ্ধতি সম্পর্কে একটু চিন্তা করলে সহজেই একথা মেনে নিতে হয় যে, প্রকৃত মানবতার জন্য এমন এক বিজ্ঞানসম্মত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যযুক্ত অর্থব্যবস্থার প্রয়োজন, যাঃ

প্রথম: অর্থনীতির স্বাভাবিক মূলনীতিসমূহকে তো বজায় রাখবে-কেননা ব্যক্তিগত আযাদীর জন্য তা অপরিহার্য কিন্তু তার প্রয়োগের ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার পরিবর্তে ব্যক্তিগণের চেষ্টা-সাধনার আযাদীকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে, যার ফলে তারা সামাজিক-সামগ্রিক স্বার্থ ও কল্যাণের দুশমন থাকবে না। শুধু তাই নয়, কার্যত তারা তার খাদেম হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয়: উল্লেখিত স্বাভাবিক নীতিসমূহের সাথে ভুল নীতির সকল প্রকার সংমিশ্রণকেই গোটা অর্থব্যবস্থা থেকে দূরে রাখবে।

তৃতীয়:সেই নীতিসমূহের সাথে সাথে স্বভাবসম্মত অর্থব্যবস্থার অপরাপর মৌলিক নীতিসমূহকে কার্যকরী করবে।

চতুর্থ: ব্যক্তিগণকে সেই স্বাভাবিক মূলনীতিসমূহের বিরুদ্ধতা করতে এবং তাদের প্রকৃত দাবীকে অস্বীকার করে চলতে দিবে না।

ইসলামের প্রতিবিধান

ইসলাম ঠিক এ পন্থাই গ্রহণ করেছে। ইসলাম 'অবাধ অর্থব্যবস্থা'কে 'স্বাধীন অর্থ ব্যবস্থায়' পরিণত করে এবং তাকে কতক বিধি-নিষেধ ও সীমা-সরহদের মধ্যে ঠিক তেমনিভাবে বেঁধে দেয়, যেমন সমাজ ও তামাদ্দুনের অন্যান্য সমগ্র বিভাগে মানবীয় আযাদীকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। সেই সাথে আযাদ অর্থব্যবস্থায় বিপর্যয়মূলক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিশেষ প্রভাব ও কুফল সৃষ্টি হওয়ার সকল প্রকার পথকেও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। ইসলামের মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে কিরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে, অতপর আমরা তা যথাসম্ভব বিস্তারিতরূপে পেশ করতে চেষ্টা করব ।

১. জমির মালিকানা

ইসলামে অপরাপর জিনিসের মত জমির উপরও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছে। কোনো জিনিসের উপর কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী হওয়ার জন্য যতগুলো আইনগত রূপ নির্দিষ্ট আছে সেই সকল রূলেই জমিও অন্যান্য জিনিসের মতোই একজনের মালিকানাভুক্ত হতে পারে। এর কোনো সীমাও নির্দিষ্ট নেই, এক বর্গগজ থেকে কয়েক সহস্র একর পর্যন্ত যতখানি জমিই হোক না কেন, আইনসম্মত উপায়ে ও নিয়মে কারো মালিকানাভুক্ত হলে, সে অবশ্যই তার বিধিসম্মত মালিক হবে-তা তার বৈধ মালিকানা সম্পত্তিরূপে গণ্য হবে। নিজের জমি যে নিজেরই চাষাবাদ করতে হবে, এ মালিকানার বৈধতার জন্য তারও কোনো শর্ত নেই। বাড়ী-ঘর ও আসবাবপত্র যেমন ভাড়ায় দেয়া যায়, জমিকেও তেমনি ভাড়া হিসাবে লাগানো যেতে পারে। ফসলের শরীকানা নিয়মেও কৃষিকাজ চলতে পারে। ভাড়া ছাড়াই

কাউকেও জমি দান করলে, ফসলের ভাগ না নিয়েই কাউকে নিজের জমি চাষ করার জন্য দিলে তা সাদকা বা দানরূপে গণ্য হবে। কিন্তু ভাড়া ও বার্ষিক কেরায়া এবং ফসল বণ্টনের ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন করা ব্যবসায়ে অংশীদারী কিংবা কোনো জিনিস ভাড়ায় লাগাবার মতো বিধিসম্মত জায়েয। তবে সামন্তবাদী ব্যবস্থার যেসব দোষ-ত্রুটি আমাদের সমাজে রয়েছে, তা না নিছক জমিদারী পদ্ধতির ফল, না জমির ব্যক্তিগত মালিকানাকে উচ্ছেদ করা তার কোনো চিকিৎসা বা সংশোধন হতে পারে। পরন্তু এ যুগের আধা হেকীমদের প্রস্তাবিত কৃষি সংশোধনের ন্যায় কৃত্রিম বাধ্যবাধকতা আরোপ করায়ও তা কল্যাণকর হয় না। বরং ইসলামী আদর্শের মূলনীতির ভিত্তিতে তার সঠিক চিকিৎসা নিম্নরূপ হতে পারে:

এক: জমি ক্রয়-বিক্রয়ের পথে প্রবর্তিত যাবতীয় বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করা এবং দুনিয়ার অন্যান্য সাধারণ জিনিসের মতোই তার লেনদেন সহজসাধ্য করা আবশ্যক।

দুই: কৃষিজীবি ও অকৃষিজীবি শ্রেণীসমূহের মধ্যে স্থায়ী পার্থক্য করার রীতি সকল দিক দিয়ে ও সর্বপ্রকারেই চিরতরে খতম করে দেয়া দরকার।

তিন: আমাদের জীবন ও সমাজে জমির মালিকদের জন্য যে বৈশিষ্টপূর্ণ অধিকারের ব্যবস্থা রয়েছে, তার সবকিছুই আইনত বাতিল করে দেয়া বাঞ্ছনীয়।

চার: জমি-মালিক ও কৃষক-চাষীর পারস্পরিক অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব আইনের দৃষ্টিতেই নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবং সেই সুনির্দিষ্ট অধিকার ছাড়া আর কোনো প্রকার অধিকারই কৃষকদের উপর জমির মালিকদের জন্য স্বীকার্য নয়।

পাঁচ: জমিদারী সহজ অর্থে জমির মালিকানা কেবলমাত্র একটি বিশেষরূপেই অবশিষ্ট থাকতে দেয়া হবে, মালিক ও কৃষকের মাঝখানে অবশিষ্ট ব্যবসায়ে সমান শরীকদ্বয়ের মধ্যবর্তী সম্পর্কের অনুরূপ সম্পর্কই থাকতে দেয়া হবে। এছাড়া যেসব জমিদারী যুলুম-পীড়ন ও শোষণের হাতিয়ার হয়ে কাজ করে 'রাষ্ট্রের অধীন রাষ্ট্র' হওয়ার সুযোগ পেয়ে বসে কিংবা যাকে অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক 'ক্ষমতা' লাভের উপায়ও বানিয়ে নেয়া হয়। তা যেহেতু বৈধ ও সংগত জমিদারী আওতা বহির্ভূত এজন্য তা সঙ্গত জমিদারীও জায়েয মালিকানার অনুরূপ সংরক্ষণ লাভ করতে পারবে না।

ছয়ঃ মীরাস বণ্টনের ব্যাপারে যেসব ইসলাম বিরোধী রসম-রেওয়াজ চালু রয়েছে, তা সবই খতম করে দিতে হবে। জমি মালিকদের বর্তমান সম্পত্তি শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী তাদের জীবিত উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে এবং ভবিষ্যতেও কৃষি সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইসলামের মিরাসী আইন যথাযথরূপে কার্যকরী করতে হবে।

সাতঃ কৃষি জমি অকর্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। যেমন, সরকার যেসব জমি কাউকে বিনামূল্যে বন্দোবস্ত দিয়ে থাকলেও তিন বছরের অধিককাল অকর্ষিত রাখা হলে এ 'দান' বাতিল করতে হবে। অনুরূপভাবে ক্রয় করা জমিও বেকার ফেলে রাখলে এক বিশেষ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তার উপর কর ধার্য করতে হবে।

আট: জমি-মালিক ও কৃষক-চাষীদের উৎপন্ন ফসল থেকে এক নির্দিষ্ট অংশ যাকাতের জন্য নির্দিষ্ট খাতসমূহে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করতে হবে। নয়: আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় বৃহদায়তন কৃষিকার্য সম্পাদন করতে হলে পারস্পরিক সাহায্যের এমন ধরনের সংস্থা কায়েম করতে হবে যাতে ক্ষুদ্রায়তন জমি মালিকগণ নিজেদের ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার বজায় রেখেই পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তোষের ভিত্তিতে নিজেদের সম্পত্তিকে বৃহদাকার কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করে নিবে এবং সকলে মিলিতভাবে একটি সংস্থা হিসেবে তার কাজ সম্পন্ন করবে।

এসব সংশোধনী ব্যবস্থা কার্যকরী হলে জমিদারী ও বৃহদায়তন জমি-মালিকানার এমন কোনো ক্রুটিই অবশিষ্ট থাকতে পারে না, যা যুক্তিসঙ্গতভাবে পেশ করা যেতে পারে।

২. অন্যান্য উৎপাদন উপায়

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবহারিক পণ্য ও উৎপাদন উপায়ের মাঝে কোনোই পার্থক্য সমর্থিত নয়। কাজেই এক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা চলবে, আর অপর ক্ষেত্রে তা বৈধ হবে না, এটা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। একজন মানুষ অপর লোকদের জন্য তাদের নিত্য প্রয়োজ নীয় কোনো জিনিস তৈরি কিংবা সংগ্রহ করবে ও তার নিকট তা বিক্রি করবে, ইসলাম একে বিধিসম্মত কাজ বলে মনে করে। এ কাজ সে নিজ হাতেও করতে পারে এবং অপর লোকদের দ্বারা মজুরীর বিনিময়েও করাতে পারে। এরূপ পণ্য উৎপাদন বা সংগ্রহ করার কাজে যেসব কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও কর্মক্ষেত্র ব্যবহার করবে, সেসব কিছুরই মালিক হতে পারে। এটা যেমন শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তী পর্যায়ে বিধিসম্মত ছিল, তেমনি বিধিসম্মত তার পরবর্তী অধ্যায়েও। কিন্তু অবাধ শিল্প ব্যবসায় না পূর্বে কখনো বৈধ ছিল, না এখন তা কোনো দিক দিয়েই সমীচীন হতে পারে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাকে নিম্নলিখিত নিয়ম-প্রণালী মেনে চলতে বাধ্য করা কর্তব্য ছিল-এখনো তাই কর্তব্য।

এক: যে শৈল্পিক আবিষ্কার উদ্ভাবন মানবীয় শক্তি-শ্রম-মেহনতের পরিবর্তে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করে দেয়, তা শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পূর্বে তা কত সংখ্যক মানুষের জীবিকা নষ্ট করবে এবং সেই বেকার লোকদের জীবিকার ব্যবস্থা কি হবে, তার সুষ্ঠু বিচার-বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক এটা না করে উক্ত আবিষ্কার উদ্ভাবন ব্যবহারের অনুমতি কিছুতেই দেয়া যেতে পারে না।

দুই: শ্রমিক মালিককে পারস্পরিক অধিকার, কর্তব্য ও কাজের শর্ত ইত্যাদির সবিস্তার নির্ধারণের কাজ অবশ্যই পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক সমঝোতার উপর ন্যস্ত করতে হবে। কিন্তু সরকার নিজ থেকে ইনসাফের কয়েকটি মৌলিক নিয়ম অবশ্যই নির্দিষ্ট করে দিবে। যেমন একজন শ্রমিকের নিম্নতম বেতন বা মজুরীর হার, সর্বোচ্চ কার্য সময়, রোগের চিকিৎসা, দৈহিক

অঙ্গহানির ক্ষতিপুরণ এবং সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে গেলে পেনশনের নিম্নতম অধিকার প্রভৃতি ব্যাপারসমূহ।

তিন: শ্রমিক মালিকের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব সরকারকে নিজ হাতে গ্রহণ করতে হবে এবং সেজন্য পারস্পরিক সমঝোতা, সালিসী ও আদালতের এমন একটি প্রণালী নির্দিষ্ট করে দিবে, যার ধর্মঘট ও লক আউট (Lock-out) ঘোষণা করার মতো কোনো পরিস্থিতি দেখা দিতে না পারে।

চার: ব্যবসা-বাণিজ্যে সঞ্চয় করা (Hoarding)১ ফটকাবাজারী (Speculation), ব্যবসায়ী জুয়া ও অদৃশ্য কেনা-বেচার পথ চূড়ান্তভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। সেই সাথে যেসব পন্থায় দ্রব্যমূল্যের উপর কৃত্রিম প্রভাব বিস্তার করা হয়, সেগুলোকে আইনের সাহায্যে বন্ধ করে দিতে হবে।

পাঁচ: উৎপন্ন দ্রব্য ও ফসল ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে দেয়াকে অপরাধরূপে গণ্য করতে হবে।

ছয়: শিল্প ও ব্যবসায়ের সকল বিভাগকেই যথাসাধ্য প্রতিযোগিতার জন্য উন্মুক্ত ও অবাধ করতে হবে। একচেটিয়া ব্যবসা চালাবার সুযোগ দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা দলকে বিশেষ বৈষম্যমূলক অধিকার দেয়া যেতে পারে না এবং অপরদের তা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। সাত: যেসব শিল্প ও ব্যবসায় জনগণের নৈতিক চরিত্র কিংবা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তা চলার অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। এ ধরনের কোনো জিনিস যদি কোনো দিক দিয়ে অপরিহার্য বিবেচিত হয়, তবে তার শিল্প ও ব্যবসায়ের উপর প্রয়োজনানুরূপ প্রতিবন্ধকতা ও নিয়ন্ত্রণ বসাতে হবে।

আট: সরকার অবশ্য নাৎসী নিয়ম অনুযায়ী যাবতীয় শিল্প ব্যবসায়কে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব অধিকার (Control) আনয়ন করবে না, কিন্তু পথনির্দেশ (Direction) ও সামঞ্জস্য বিধানের (Co-ordination) কাজ অবশ্যই আনজাম দিবে যেন বিশ্বের শিল্প ও ব্যবসায় ভ্রান্ত পথে চলে না যায় এবং অর্থনৈতিক জীবনের সকল বিভাগের মধ্যেই পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। নয়: ইসলামে মিরাসী আইনের সাহায্যে জমি-মালিকদের সম্পত্তির মত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সঞ্চিত পুঞ্জিকৃত অর্থ-সম্পদকেও নিরন্তর বণ্টন করতে হবে। যেন কোনো স্থায়ী ধনী শ্রেণীর সৃষ্টি হতে না পারে।

দশ: কৃষিজীবিদের ন্যায় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও কারবারী লোকদের আমদানীর একটি অংশ যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই আদায় করতে হবে।

ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান

অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তির অধিকার সমর্থন করে। একজন ব্যক্তি তার আয়ের প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ সঞ্চয় করবে কিংবা অপরকে ঋণ বাবদ দান করবে, অথবা নিজের কোনো ব্যবসায় নিয়োগ করবে বা কোনো শিল্প ব্যবসায়ে নিজের পুঁজিদানে তার লাভ লোকসানের অংশীদার হবে। ইসলাম এতে কোনো বাধা দেয় না। যদিও উদ্বৃত্ত অর্থ সমাজ কল্যাণমূলক কাজে নিয়োগ করাই ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তম কাজ; কিন্তু তা সত্ত্বেও উপরোক্ত চার ধরনের কাজকেও বিধিসম্মত বলে ঘোষণা করে। কিন্তু সেইজন্য নিম্নলিখিত নিয়ম-বিধি যথাযথরূপে পালন করা অবশ্যই কর্তব্য।

এক: অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা হলে তা থেকে বার্ষিক শতকরা ২.৫০ টাকা হিসেবে যাকাত বাবদ অবশ্যই আদায় করতে হবে এবং যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের কাজে তা ব্যয় করতে হবে। সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হবে তখন তার সমগ্র সম্পদ ইসলামের মিরাসী আইন অনুযায়ী তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

দুই: কাউকে ঋণ বাবদ দেয়া হলে সে কেবল নিজের দেয়া মূল টাকাই ফেরত নিতে পারবে। সে কোনো অবস্থায়ই সুদ গ্রহণ করার অধিকারী হবে না। এ ঋণ গ্রহণকারী তা নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রহণ করুক, অথবা কোনো শিল্প বা বাণিজ্যে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করুক, সবই সমান কথা, অনুরূপভাবে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে কোনো জমি বা সম্পত্তি যদি বন্ধক রেখে থাকে, তবে সে তা থেকে কোনো ফায়দাই গ্রহণ করতে পারবে না। ঋণের বিনিময়ে যে কোনো ফায়দাই হোক গ্রহণ করলেই তা সুদ হবে। কাজেই তা কোনোরূপেই গ্রহণ করা যেতে পারে না। এ মাসয়ালার ভিত্তিতে সহজেই এ 'কিয়াস' করা যেতে পারে যে, নগদ ক্রয়ের ব্যাপারে পণ্যের এক প্রকার মূল্য হওয়া এবং বাকী ক্রয়ের ব্যাপারে অন্য প্রকার মূল্য নির্ধারণ করাও জায়েয নয়।

তিন: শিল্প, ব্যবসায় কিংবা কৃষিকাজে সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করা হলে জমি ও অন্যান্য উৎপাদন উপায় প্রসঙ্গে বর্ণিত নিয়ম প্রণালী অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

চার: অংশীদারমূলক কারবার হলে লাভ-লোকসানে উভয়কেই সমান হারে শরীক হতে হবে। একটি নির্দিষ্ট হারে উভয়কেই অংশীদার হতে হবে। শরীকদারীমূলক যে ব্যবসায়ে পুঁজি মালিক কেবল মুনাফারই ভাগীদার হবে ও নির্দিষ্টহার অনুযায়ী অবশ্যই মুনাফা পাবে- (লোকসানের কোনো চাপ তাকে গ্রহণ করতে হবে না) এমন সকল কারবারই আইনত অগ্রাহ্য ও অবৈধ হবে।

যাকাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি

যাকাত অর্থ পাক হওয়া, বেড়ে, যাওয়া, বিকশিত হওয়া। শরিয়ার পরিভাষায় যাকাত হচ্ছে একটি আর্থিক ইবাদত। প্রত্যেক সাহিবে নিসাব মুসলমান তার মাল থেকে শরিয়তের নির্ধারিত পরিমাণ মাল ঐসব লোকের জন্য বের করে যারা শরিয়ত অনুযায়ী যাকাত নেয়ার হকদার। নামায ও যাকাত প্রকৃতপক্ষে গোটা দ্বীনের প্রতিনিধিত্বকারী দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। দৈহিক ইবাদতে নামায সমগ্র দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করে। আর আর্থিক ইবাদতে যাকাত সমগ্র দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করে। নামায আল্লাহর হক আদায় করার জন্য বান্দাহকে তৈরি করে এবং যাকাত বান্দাহদের হক আদায় করার গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করে। যাকাত দিলে ব্যক্তির সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। যারা গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নির্দেশ মতো তাঁর পথে ব্যয় করেন, পরম করুণাময় আল্লাহ এর বিনিময়ে কেবল পরকালে নয়; দুনিয়াতেও ব্যাপক বরকত, সচ্ছলতা ও উন্নতি দান করেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যে যাকাত দাও, মূলত যাকাত দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে। (সূরা রুম : ৩৯)।

এখন প্রশ্ন হলো যাকাত যাকাতদাতার সম্পদকে কিভাবে বৃদ্ধি করে? আল-কুরআনের এই ঘোষণা অনুযায়ী যাকাতদাতার সম্পদ কিভাবে বৃদ্ধি পায় তা যাকাতদাতা ও আমাদের সমাজের কেউই অবগত নন। বিষয়টি যদি সবাই জানতেন তাহলে যাকাতদানে উৎসাহিত হতেন।

যাকাতের মর্যাদা যাকাত ইসলামের তৃতীয় বৃহৎ রুকন বা স্তম্ভ। দ্বীনের মধ্যে নামাযের পরই যাকাতের স্থান। নামাযের মতই মুসলমানদের নিকট যাকাতের ভূমিকা হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু মুসলিম জনগণের কাছে যাকাতের গুরুত্ব সেরূপ হয়নি। নামায কায়েমের জন্য যত মসজিদ তৈরি হয়েছে যাকাত কায়েমের বা আদায়ের জন্য মুসলিম জাহানে বিশেষ করে বাংলাদেশে ততটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। এটাই প্রমাণ করে যে, কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ-এ যাকাতকে নামাযের সমগুরুত্ব দিলেও মুসলিম আলেম-ওলামা ও জনগণ যাকাত কায়েমে সে পরিমাণ গুরুত্ব দেননি। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের সুফল থেকে মুসলিম জনগণ আজ বঞ্চিত, অভাবী ও দারিদ্র্যপীড়িত। এ সুযোগে ক্ষুদ্র ঋণের নামে দারিদ্র্য দূর করার জন্য অনেকেই এগিয়ে আসেন। এতে দারিদ্র্য সাময়িকভাবে কিছুটা দূর হলেও অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী রূপ লাভ করে। ক্ষুদ্র ঋণের পেছনে পুঁজিপতিদের অদৃশ্য বেনিফিট দারিদ্র্য দূর না করে ওদের নিজেদেরকেই লালন করে থাকে। যদি সত্যিকার দারিদ্র্যবিমোচন করতে হয় তাহলে সুদমুক্ত যাকাতভিত্তিক ব্যবস্থার অন্যকোনো বিকল্প নেই।

যাকাতের মর্মকথা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যখন মু'মিন তার প্রিয় এবং পছন্দসই মাল আল্লাহ্র পথে সন্তুষ্টচিত্তে ব্যয় করে তখন সে মু'মিনের দিলে এক নূর এবং উজ্জ্বলতা পয়দা হয়। বস্তুগত আবর্জনা ও দুনিয়ার মহব্বত দূর হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা এ আমলের দ্বারা মু'মিনের দিল থেকে দুনিয়ার সকল প্রকার বস্তুগত মহবত বের করে নিয়ে সেখানে তাঁর আপন

মহব্বত বসিয়ে দিতে চান। এ জন্য শরিয়ত যাকাতের একটি আইনগত সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছে যে, এতটুকু খরচ না করলে ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে।

যাকাতব্যবস্থার উদ্দেশ্য যাকাতব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে মু'মিনের দিল থেকে দুনিয়ার মহব্বত ও তার মূল থেকে উৎপন্ন যাবতীয় ঝোপ-ঝাড় ও জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে আল্লাহ্র মহব্বত পয়দা করতে চায়। এটা তখনই সম্ভব যখন মু'মিন বান্দা শুধু যাকাত দিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। বরঞ্চ যাকাতের সেই প্রাণশক্তি নিজের মধ্যে গ্রহণ করার চেষ্টা করে এবং মনে করে আমার কাছে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্র। যাকাতের ঐ প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য আত্মস্থ না করে কেউ আল্লাহর জন্য মহব্বত করতে পারে না। আর যা আল্লাহর হক জেনে নিয়ে তা পূরণ করার জন্য সজাগ ও মুক্ত হস্ত হতে পারে। যাকাতব্যবস্থা আসলে গোটা ইসলামী সমাজে কৃপণতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, মনের কঠিনতা এবং শোষণ করার সূক্ষ¥ প্রবণতা থেকে পাক পবিত্র করে। তার মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, ত্যাগ, দয়া-দাক্ষিণ্য, নিষ্ঠা, শুভাকাঙ্ক্ষা, সহযোগিতা, সাহচর্য প্রভৃতি উন্নত ও পবিত্র প্রেরণার সঞ্চার করে এবং সেগুলোকে বিকশিত করে।

যাকাতের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব ঈমানের পর প্রথম দাবিই হচ্ছে নামায ও যাকাতের। প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি ইবাদত পালন করার অর্থ গোটা দ্বীন পালন করা। যে বান্দাহ মসজিদের মধ্যে আল্লাহর সামনে গভীর আবেগ সহকারে তার দেহ ও মন বিলিয়ে দেয়, সে মসজিদের বাইরে আল্লাহ্র হক কিভাবে অবহেলা করতে পারে? ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি তার প্রিয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্র পথে সন্তুষ্টচিত্তে বিলিয়ে দিয়ে মনের গভীর শান্তি অনুভব করে, সে অন্যান্য বান্দাদের হক কিভাবে নষ্ট করতে পারে? আর ইসলাম তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও বান্দার হকেরই বহিঃপ্রকাশ। এজন্য কুরআন নামায এবং যাকাতকে ইসলামের পরিচায়ক এবং ইসলামের গভীর মধ্যে প্রবেশের সাক্ষ্য বলে গণ্য করে।

এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী সরকার কর্তৃক যাকাত উসুল করা হতো এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তা বণ্টন করা হতো। প্রশ্ন হতে পারে, বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত না থাকা অবস্থায় কিভাবে যাকাত পরিশোধ করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারী ইসলামী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকাত আদায় করে কুরআন নির্ধারিত খাতসমূহে তা বণ্টনের ব্যবস্থা করাই যাকাত আদায়ের সর্বোত্তম পন্থা। ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দানের ক্ষেত্রে অনেক ফেতনা রয়েছে। এতে মনে প্রদর্শনেচ্ছা সৃষ্টি হতে পারে। যাকাত দানকে অনুগ্রহ বা করুণা বিবেচনা করা হতে পারে। ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের যে কর্মসূচি তার মধ্যে যাকাত একটা ভূমিকা পালন করে যেখানে রাষ্ট্র যাকাত আদায় করবে। কী পরিমাণ যাকাত আমাদের দেশে আদায় হতে পারে তার একটা হিসাব ২০০২ সালে করা হয়েছে। আমাদের দেশে এক বছরে প্রায় ২৪০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে। যদি সঠিকভাবে যাকাত আদায় করা হয় তাহলে আমাদের দেশে বছরে প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব। এটা যদি সিস্টেমেটিক্যালি করা যায় সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে এবং এমন

ভাবে দেয়া হবে যে গ্রহীতা ব্যক্তি জীবনের মতো স্বাবলম্বী হয়ে যায়। হযরত ওমর রা.-এর বিখ্যাত বক্তব্য হলো : তুমি এমনভাবে দাও যাতে সে ধনী হয়ে যায়। অর্থাৎ তাকে যেন আর কোনোদিন যাকাত না নিতে হয়। যাতে তার কোনো না কোনো কাজের ব্যবস্থা হয়ে যায়। একটা (ঝবষভ বসঢ়ষড়ুসবহঃ) হয় এবং পরবর্তীতে সে যেন যাকাতগ্রহীতা না হয়ে যাকাতদাতা হতে পারেন। কাজেই যাকাতের কার্যকারিতা পেতে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সা. যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু করার মাত্র পাঁচ বছর পর হযরত ওমর রা. এর আমলে গরিব লোক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল। তাই জাজিরাতুল আরব হয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক পরাশক্তি। বর্তমানে বিশ্বে তথা বাংলাদেশে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির সুফলকে চিন্তা না করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধাঁচে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য পথ খুঁজছে। বাংলাদেশে আজ পুঁজিবাদী অর্থনীতি অসম বণ্টনের ফলে চরম ধনবৈষম্য সৃষ্টি করে ২৫ শতাংশ লোকের কাছে ৭৫ শতাংশ সম্পদ এবং বা ৭৫ শতাংশ লোকের কাছে মাত্র ২৫ শতাংশ সম্পদ, যা এক করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য মৌলবাদী অর্থনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি জাতিকে মুক্তি দিতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতকে যদি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে বাংলাদেশ হবে সত্যিকার ইসলামী সোনালি যুগের সোনার বাংলাদেশ।

ইসলামে ‘করজে হাসানাহ’র নির্দেশ ও উপকারিতা

নিঃশর্ত ঋণ আদান-প্রদানের ইসলামি পরিভাষা হলো ‘করজে হাসানাহ’। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদেই এ ধার বা ঋণ আদান-প্রদান করে থাকে। ইসলামি অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা ‘করজে হাসানাহ’র ফজিলত ও সাওয়াব অপরিসীম। কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা থেকেই তা প্রমাণিত। করজে হাসানা বা উত্তম ঋণের বিনিময় সম্পর্কে একাধিক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

১. ’তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, জাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।’
(সুরা মুযাম্মিল : আয়াত ২০)

২. ‘নিশ্চয়ই দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার (করজে হাসানাহ) দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।
’ (সুরা হাদিদ : আয়াত ১৮)

৩.مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ‘

তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজে হাসানাহ দিতে প্রস্তুত; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহু গুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সবাইকে ফিরে যেতে হবে।’
(সুরা বাকারা : আয়াত ২৪৫)

করজে হাসানার উপকারিতাকরজে হাসানা মানে হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের আশায় কাউকে নিঃশর্ত ঋণ দেওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে এই করজে হাসানার উপকারিতা অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় তাঁর প্রিয় সাহাবিদের করজে হাসানার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। কেননা এর মাধ্যমে মানুষ অফুরন্ত সওয়াব ও কল্যাণে ভাগিদার হতে পারে। হাদিসের একাধিক বর্ণনায় প্রমাণিত-

১. হজরত কায়স বিন রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোনো একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে দুবার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ একবার সদকা করার সমতুল্য। (ইবনে মাজাহ)

২. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার বিপদগুলো দূর করে দেবেন।’ (বুখারি)

৩. হজরত বুরাইদাহ আল-আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি (ঋণগ্রস্ত) অভাবি ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে, সে দান-খয়রাত করার সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ শোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সময় বাড়িয়ে দেবে সেও প্রতিদিন দান-খয়রাত করার সওয়াব পাবে।’ (ইবনে মাজাহ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তির কিছু ঋণ ছিল। (ঋণদাতা তাগাদা দিতে এসে কিছু অশোভনীয় আচরণ করে) সাহাবাগণ তাকে কিছু (প্রতিরোধ) করতে চাইলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, পাওনাদারের কিছু বলার হক আছে। তিনি তাদের আরও বললেন, তাকে এক বছর বয়সী একটি উট খরিদ করে দাও। সাহাবাগণ বললেন, আমরা তো তার দেয়া এক বছর বয়সের উটের মতো পাচ্ছিনা; বরং তার চেয়ে ভালো উট পাচ্ছি। তিনি বললেন, তবে তাই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কেননা যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে, সে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। কিংবা তিনি বলেছেন, সে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।' (বুখারি)

করজে হাসানাহ বা ঋণ পরিশোধে অবহেলাএমনকি কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সময়মতো ঋণ পরিশোধে অবহেলা করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্বনবি। হাদিসে এসেছে-হজরত শারিদ বিন সুওয়ায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সচ্ছল ব্যক্তি কোনো দেনা পরিশোধ করতে গড়িমসি করে, তাকে অপমান ও শাস্তি দেওয়া আমার জন্য হালাল। আল আত-তানাফিসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অপমান করা অর্থ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে এবং শাস্তি দেওয়ার অর্থ তাকে জেলখানায় বন্দি করা।' (ইবনে মাজাহ)

করজে হাসানাহ গ্রহণকারী অক্ষম হলেকিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি বাস্তবেই অক্ষম হয়, তাহলে সামর্থ্য থাকলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। হাদিসে এসেছে-হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এক ব্যক্তি লোকদের ঋণ দিত; যখন সে কোনো গরিবকে দেখত, তখন সে তার চাকরকে বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে আমাদের ক্ষমা করবেন। এরপর লোকটির মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হলে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।' (নাসাঈ)

করজে হাসানাহ দেওয়ার উৎসাহ ও দোয়ারাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভাবিকে ঋণ দেওয়ার প্রতি যেমন উৎসাহ দিয়েছেন, তেমনি সময় মতো ঋণ পরিশোধের প্রতিও জোর দিয়েছেন। এমনকি তিনি নিজেও সর্বদা ঋণমুক্ত জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। মানুষের কাছ থেকে উত্তম ঋণ তথা করজে হাসানা নেওয়ার পর তা পরিশোধের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা যেমন জরুরি। তেমিন তা পরিশোধে মহান আল্লাহর দরবারে ধরণা দেয়ার বিকল্প নেই।

কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধার-দেনা পরিশোধের তাওফিক কামনা করে আল্লাহ তাআলার দরবারে ধরনা দেওয়ার কথা বলেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনো পেরেসানি অনুভব করতেন, তখনই এ দোয়া পড়তেন

-اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

অর্থ : 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে আশ্রয় চাই, অপারগতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাই, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে আশ্রয় চাই এবং ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে আশ্রয় চাই।' (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

সুতরাং করজে হাসানার উপকারিতা ও সাওয়াব পেতে হলে এমনভাবে করজে হাসানা তথা উত্তম ঋণ দিতে হবে, যাতে দুনিয়ার কোনো স্বার্থ না থাকে। বরং শুধু আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ ঋণ দিতে হবে। শুধু তাই নয়, সে অর্থ এমন কাজে খরচ করতে হবে যে কাজ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন।

সুতরাং হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী করজে হাসানা বা উত্তম ঋণ গ্রহণ করার পর যদি তা পরিশোধের প্রচেষ্টা থাকে এবং ঋণ গ্রহণকারী আল্লাহর কাছে তা পরিশোধে বেশি বেশি এ দোয়া পড়ে তবে আল্লাহ তাআলা তাদের ঋণ পরিশোধের তাওফিক দান করবেন।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে করজে হাসানা গ্রহণ ও তা সময় মতো পরিশোধ করে উত্তম পুরস্কার পাওয়ার তাওফিক দান করুন। ঋণ পরিশোধের নিয়তে হাদিসে বর্ণিত দোয়া বেশি বেশি পড়ে ধার-দেনামুক্ত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

শিরকাত ও মুদারাবা

সুদের বিপরীতে সঠিক ইসলামী বিকল্প পদ্ধতি হচ্ছে শিরকাত ও মুদারাবা। যা সুদের চেয়ে কয়েকগুণ ভাল ফলাফল বহনকারী। এটা পুঁজি বিনিয়োগের অত্যন্ত সুষম ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি। সম্পদ বণ্টনের উপর যার খুবই ভাল প্রভাব পড়ে। এ দ্বারা ব্যাংকিংয়ের এ ধারণাও বিদূরিত হতে পারে, ব্যাংক ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থেকে শুধু পুঁজির যোগান দেয়ার মাধ্যম হয়। শিরকাত ও মুদারাবা ব্যবস্থা চালু হলে ব্যাংকের নাম ব্যাংকই থাকুক আর যাই থাকুক, কিন্তু ব্যাংকের এ অবস্থান শেষ হয়ে যাবে। তখন ব্যাংক যথারীতি কারবার পরিচালনা করবে।

শিরকাত ও মুদারাবার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, শিরকাতের মধ্যে অংশীদারগণ মূলধনের মধ্যেও শরিক হয় এবং কাজের মধ্যেও শরিক হতে পারে। কেউ কার্যত কারবারে হস্তক্ষেপ না করলে সে ভিন্ন কথা। আর মুদারাবার মধ্যে মূলধন থাকে পুঁজি সরবরাহকারীর আর কাজ করে কারবারী। পুঁজি সরবরাহকারী কারবারে অংশগ্রহণ করে না।

এখানে শিরকাত ও মুদারাবার কিছু মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হল। শিরকাত ও মুদারাবা পদ্ধতিতে কারবার করলে তা অনুসরণ করা জরুরি।

১. মূলধনের অনুপাতে লভ্যাংশ নির্ধারণ করা শরয়ীভাবে জায়েয নেই। লভ্যাংশ নির্ধারণ করার সঠিক শরয়ী পদ্ধতি হল প্রকৃতপক্ষে যে লাভ হবে তার শতকরা হার নির্ধারণ করতে হবে।

২. পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মুনাফার যে কোনো আনুপাতিক হার নির্ধারণ করা যাবে। যেমন কারো মূলধন চল্লিশ শতাংশ, কিন্তু তার জন্য ষাট শতাংশ লাভ নির্ধারণের শর্ত করা, অন্যজনের মূলধন ষাট শতাংশ, তার জন্য চল্লিশ শতাংশ লাভ নির্ধারণের শর্তারোপ করা, এমন করা জায়েয। পুঁজির পরিমাণ অনুসারে লভ্যাংশ বণ্টন জরুরি নয়। এ দ্বারা বুঝা গেল, বিভিন্ন অংশীদারদের জন্য মুনাফার বিভিন্ন হার স্থির করা যেতে পারে। বর্তমানের পরিভাষায় একে 'পরিমাপ' (Weightage) দেয়া বলে। বিভিন্ন অংশীদারকে বিভিন্ন পরিমাপ দেয়া যেতে পারে। তবে যে অংশীদার কাজ না করার শর্তারোপ করেছে তার মুনাফা তার পুঁজির অনুপাতের চেয়ে বেশি হতে পারবে না।

৩. লভ্যাংশের মধ্যে বিভিন্ন অংশীদারকে বিভিন্ন পরিমাপ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু লোকসানের মধ্যে এমন করা জায়েয নেই। লোকসান সর্বাবস্থায় পুঁজির অনুপাতে হবে।

মুদারাবা ব্যবস্থা প্রচলন ব্যবসা বাণিজ্য,কৃষি ও শিল্প খাতে লোনের মাধ্যমে সুদে বিলুপ্তি ঘটাতে পারে ।

মুরাবাহা

এটাও অর্থ বিনিয়োগের একটি শরয়ী পদ্ধতি হতে পারে। এর সারকথা হল, যখন কোনো লোক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করার জন্য আসবে, তখন ব্যাংক তাকে জিজ্ঞেস করবে, কোন্ বস্তুর জন্য অর্থ দরকার। ব্যাংক তাকে নগদ অর্থ প্রদানের পরিবর্তে সে বস্তু ক্রয় করে মুরাবাহা হিসেবে লাভের উপর বাকিতে বিক্রি করে দেবে। লভ্যাংশ দরদাম করে যে কোনো মূল্য স্থির করে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু লাভের একটা হার নির্ধারণ করে মুরাবাহা এ জন্য করা হয়, যাতে নীতিমালার মধ্যে সমতা থাকে এবং সব মানুষ থেকে একই হারে লাভ উসুল হয়। লাভের যে হার নির্ধারণ করা হয় তাকে বলা হয় মার্ক আপ (Mark up)।

এটাও পুঁজি বিনিয়োগের একটি জায়েয পদ্ধতি হতে পারে। শর্ত হল, সঠিক ও প্রয়োজনীয় শর্তের সাথে সম্পাদন করতে হবে। কারণ, বাকির কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা ফুকাহাদের সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ব্যাপক হারে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এটা খুবই স্পর্শকাতর পদ্ধতি। এর মধ্যে সামান্যতম অসতর্কতা তাকে সুদী ব্যবস্থার সাথে মিশ্রিত করে দেয়। আজকাল ব্যাংকগুলোতে মুরাবাহার মূল তত্ত্ব না বুঝে এবং তার প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ না করেই তা প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলে তাতে বহু দোষ সৃষ্টি হয়। সাধারণত ব্যাংক থেকে মুরাবাহার লেনদেন করার সময় যে ভুলগুলো হয়ে থাকে এবং সঠিক শরয়ী পদ্ধতিতে মুরাবাহা করার সময় যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

উক্তর পদ্ধতি শরয়ী বিধান অনুযায়ী করলে তা সুদের বিপরীতে একটি ফলপ্রসু বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে।

মুসলমানের করণীয়

আমরা অর্থনীতির সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করলাম। ভগ্ন প্রায় এই অর্থ ব্যবস্থাকে কিভাবে পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষের জন্য কল্যাণকর ও ন্যয়নিষ্ঠ করে গড়ে তোলা যায় সেই বিষয়ে ইসলামের দিক নির্দেশনা। তবে কোন দিক নির্দেশনায় কাজে আসবে না যদি আমরা মুসলমানরাতা যথাযথ ভাবে ভাবে পালন না করি। প্রতিটি মানুষ যদি ব্যক্তিগতভাবে একটু একটু করে অবদান রাখে তাহলে বড় সমস্যাকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাধান করা সম্ভব। একে অন্যের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে হয়তো কোন সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না। অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো জটিল, সমাধানের জন্য প্রয়োজন সমষ্টিক শ্রম, দীর্ঘসময়।তবে আজ যদি আমরা একটা চারাগাছ রোপন করি, তাহলে সেটি হয়তো ১০০ বছর পর হলেও ফল দিবে। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়া ছাড়া মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি অসম্ভব।

একটি বৈষম্যহীন অসুস্থ পৃথিবী গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার দূর করা জরুরী। অতএব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারী আমরা যা করতে পারি -

- সর্বাবস্থায় ইসলামের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করা।অবৈধ পন্থা পরিহার করা
- রাসুলের(স) আঁকড়ে ধরা.।সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন গড়া
- প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা।জ্ঞানের প্রচার প্রসারে চেষ্টা করো।
- অর্থনীতি বিষয় জ্ঞান অর্জন করা।অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই কেবল এর ত্রুটিও সমাধান খোজা সম্ভব।
- অর্থনীতি বিষয়ক উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন আলেম তৈরি করা। যারা বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান রাখবেন। যারা অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে যুগোপযোগী সমাধান দিতে সক্ষম হবেন।
- শ্রম অনুযায়ী যার যার ন্যায্য মজুরি আদায় করা। শ্রমিক, কর্মচারী বা অধীনস্থদের জুলুম না করা। তাদের অধিকারের প্রতি সচেষ্ট থাকা।
- অন্যের সম্পত্তি অন্যায় ভাবে দখল না করা।মিরাসী আইন অনুযায়ী সকল উত্তরাধিকারের মধ্যে সম্পদ বন্টন করে দেওয়া।
- সর্বাত্মকভাবে সুদি কারবারি পরিহার করা। সুদ ভিত্তিক যে কোন লেনদেন, ব্যবসা, বাণিজ্য চাকরি থেকে বিরত থাকা।
- সুদি লেনদেনের পরিবর্তে যাকাত, কর্জে হাসানা, মুদারাবা, মুরাবাহা ইত্যাদি ইসলামী কর্মপন্থা অবলম্বন করা।
- যাকাত ফরজ হলে যথাযথ বিধি-বিধান অনুযায়ী তা আদায় করা। আল্লাহর নির্ধারিত খাতসমূহই যাকাত আদায় করা ।
- সামর্থ্য অনুযায়ী সাদাকা করা এবং অন্যকে সাদাকাত করতে উৎসাহিত করার।

- সামাজিকভাবে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তুলে এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। যাতে করে সুদের ছড়াছড়ি কিছুটা হলেও কমানো যায়।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্ভব না হলেও সামাজিকভাবে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তুলে এলাকার যাকাত সংগ্রহ করা এবং তা শনির্ধারিত খাতে পরিকল্পনা মাফিক আদায় করা। যাতে এলাকার নিম্ন বিত্ত মানুষের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়
- ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা অবলম্বন করা। অনৈতিক পন্থা পরিহার করা। অন্যের হক না কর।
- অপচয় না করা এবং কৃপণতা পরিহার করা।
- উপার্জিত অর্থ কল্যাণকর খাতে ব্যয় করা। অধিক পুঞ্জীভূত করার মানসিকতা দূর করা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ কাজে ব্যয় করা।
- বাড়ি গাড়ি জায়গা জমি বা আর কিছুটা আরামদায়ক জীবন যাপনের জন্য লোনের দ্বারস্থ না হওয়া।

- ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি সমূহ জনসাধারণের মাঝে প্রচার প্রসার করা। প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থার ইসলামী অর্থব্যবস্থার পার্থক্য ও উপযোগিতা তুলে ধরা।
- অল্পে তুষ্ট থাকা এবং বেশি বেশি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।
- আল্লাহর কাছে অধিক হারে দোয়া করা, যাতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের ধনী গরিবের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করেন এবং একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়নিষ্ঠ সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টাকে কবুল করুক। আমিন।

সমাপ্ত

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

1. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসা নীতি -(মুফতি মোহাম্মদ তাকি ওসমানী)
2. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা -(খন্দকার আবুল খায়ের)
3. অর্থনৈতিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান (সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী)
4. ইসলাম ওআধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ (সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী)
5. গল্পে গল্পে অর্থনীতি (মোহাইমিন পাটোয়ারী)

সহায়ক ওয়েবসাইট লিংক

1. https://georenus.com/edu/bn/economics/what-is-economics-bangla
2. https://www.at-tahreek.com/site/show/4116
3. https://chhatrasangbadbd.com/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4-

%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0

https://www-jagonews24-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.jagonews24.com/amp/687396?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17467142617573&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.jagonews24.com%2Freligion%2Fnews%2F687396